ক্ষণ-বসন্ত

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দেড় টাকা

১৩৫১

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছেলেবেলার বন্ধুদের

করকমলে—

ক্ষণ-বসন্ত

বি-এ পাশ করার পর কৃত্তিবাসকে এক বৎসরের বেশী বসিয়া থাকিতে হয় নাই। এক জুলাইতে পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছিল, আর জুলাইতে চাকুরী,—সওদাগরী আফিসে, পঁয়ত্রিশ টাকা মাহিনা।

কৃত্তিবাস ছেলে যে খুব ভালো ছিল তাহা নয়। কিন্তু অদৃষ্ট তাহার ভালো। এই এক-টুকরা চটক মাংসের জন্য দরখাস্ত পড়িয়াছিল হাজার দুই। এম-এ, ছিল বি-এ, ছিল, ইণ্টর মিডিয়েট এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করাও অনেক ছিল। কৃত্তিবাস বলে, জলপানি পাইয়াছে এমন ছেলেও কম ছিলনা। প্রথম একদফা শ্রুতি-লিখন এবং অঙ্কের পরীক্ষা হয়। তারপরে সাহেব নিজে মৌখিক আর একদফা পরীক্ষা লয়। দুই হাজার প্রার্থী, লওয়া হইবে মোটে একজনকে। এমন অবস্থায় পাইপ-মুখে যেমন করিয়া প্রশ্ন করিতে হয় সাহেব তাহার ত্রুটি করে নাই,—অর্থাৎ উত্তর করিবে কি, সাহেবের প্রশ্ন কেহই বুঝিতে পারে নাই। কৃত্তিবাস আন্দাজে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিয়াছিল। তাহার মধ্যে একটা লাগিয়া গিয়াছিল। সেজন্য অত প্রার্থীর মধ্যে, এমন কি জলপানি পাওয়া ভালো ছেলে থাকা সত্ত্বেও কৃত্তিবাসকেই সাহেব পছন্দ করে।

কিন্তু এই সকল কৃত্তিবাসের নিজের কথা। আমরা জানি, ইহার ভিতর আরও অনেক কথা আছে। বাঙ্গালীর ছেলেরা আজকাল আর সাহেব দেখিলে আভূমিচুম্বিত সেলাম করেনা। যে কারণেই হউক, সে প্রথাটা আজকাল উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু সাহেবের ধারণা, ইহারা সকলেই বোমা তৈরী করিতেছে বলিয়া

ভক্তির ক্ষীণতা ঘটিতেছে। বাঙ্গালীর হৃষ্টপুষ্ট ছেলে সাহেব দু'চক্ষে দেখিতে পারেনা। নিতান্ত পঁয়ত্রিশ টাকায় আসল কিম্বা নকল কোনো প্রকার সাহেব পাওয়া যায়না বলিয়াই বাঙ্গালী কেরাণী রাখা। এইপ্রকার মানসিক অবস্থায় কৃত্তিবাসকে আভূমিচুম্বিত সেলাম করিতে দেখিয়া তাহার বিশ্বাস হয় যে, এ ছেলে আর যাহাই হউক, বোমা তৈরী করেনা। সুতরাং কৃত্তিবাসের চাকুরী হইয়া যায়।

কিন্তু কৃত্তিবাসেরও এ-হেন পরমাভক্তির উদ্রেক হওয়ার কারণ ছিল। বাবা যে তাহাকে কি কষ্ট করিয়া মানুষ করিয়াছেন,—অর্থাৎ বি-এ পাশ করাইয়াছেন তাহা সে জানে, আর জানে হরিরাম দত্ত। এই ব্যাপারে দত্তদের ঘরে কৃত্তিবাসের পিতার মাথা পর্য্যন্ত ঋণে ডুবিয়া আছে। কৃত্তিবাসের অবস্থা নিতান্ত অস্বচ্ছল নয়। ঘরে যে ধান এবং গুড় হয়, তাহাতে সমস্ত পরিবারের সম্বৎসরের মোটা ভাত-কাপড় হইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। এই উদ্বৃত্ত ফশলের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই, তিনি পুত্রকে কলেজে পড়াইতে সাহস করিয়াছিলেন। কিন্তু গত কয়েক বৎসর ফশলের অবস্থা ভালো নয়। তাহাতে বড় জোর সমস্ত সংসারের সম্বৎসরের খরচটুকু টানাটানি করিয়া চলিতে পারে। আবার যাহাও বা ফশল হইয়াছে তাহার দাম নাই। ছেলের একমাসের খরচের টাকা পাঠাইতে হইলে একটা গোলার ধান নিঃশেষে বিক্রয় করিতে হয়। পরিবারবর্গের মুখ চাহিয়া কৃত্তিবাসের পিতা ধান বিক্রয় করিতে পারেন নাই, দত্তদের ঘরে পরের পর হ্যাণ্ডনোট কাটিয়াছেন। প্রথম প্রথম হ্যাণ্ডনোট, পরে হ্যাণ্ডনোটে আর ধার

পাওয়া যায়না। অথচ ছেলে পড়াইতে পড়াইতে মধ্য-পথে বন্ধ করাও চলেনা। অবশেষে একটি একটি করিয়া কৃত্তিবাসের জননীর স্বল্পাবশিষ্ট গহনাগুলিও বাঁধা পড়িতে লাগিল। গহনাগুলি বাঁধা দিতে অন্তরালে মা চোখের জল মুছেন, প্রকাশ্যে বলেন, আমার গহনায় কি হবে? ছেলে বেঁচে থাক, সে-ই আমার গহনা। মায়ের চোখের জল কৃত্তিবাস দেখিয়াছিল।

শুধু তাই নয়। কৃত্তিবাসের ছোট কয়েকটি ভাই আছে, তাহাদের লেখাপড়ার ব্যয় কৃত্তিবাসকে যে কোনো প্রকারে নির্ব্বাহ করিতেই হইবে। বোনের বিবাহ দেওয়া আছে, দেখিতে দেখিতে বোনটিও বড় হইয়া উঠিল। ইহার উপর কৃত্তিবাস বিবাহ করিয়াছে। বধূ বড়লোকের মেয়ে, তাহাকে লইয়াও কৃত্তিবাস মনে মনে বড় বিব্রত হইয়া থাকে।

যে বাড়ীতে তাহার বিবাহ হইয়াছে সেখানে তাহার বিবাহ হওয়ার কথা নয়, এবং না হইলেই বোধ হয় ছিল ভালো। কিন্তু প্রজাপতির উপর মানুষের হাত নাই। কণিকার মাতুল নিজের মেয়ের জন্য কৃত্তিবাসকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের পিতার অবস্থার জন্যই হউক, অথবা অপর কোনো কারণেই হউক, যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ভাগিনেয়ীর সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করেন। পরে তাহাদের অবস্থার কথা শ্বশুরের কর্ণগোচর হয়। শ্বশুর মুখ ফুটিয়া কিছু অবশ্য বলেন নাই বটে, কিন্তু শ্যালকের সঙ্গে সকল সংস্রব চুকাইয়া দেন। সেজন্য নিজের দোষ না থাকিলেও কৃত্তিবাস শ্বশুরের কাছে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে।

এমন অবস্থায় কৃত্তিবাস যদি পঁয়ত্রিশ টাকার একটা চাকুরীর

জন্য সাহেবের কাছে আভূমিপ্রণত সেলাম করিয়া থাকে তো আমিও দোষ দিতে পারিনা, আপনিও দোষ দিতে পারেননা।

ইতিমধ্যে মেসের লোকেরা ধরিয়া বসিল, একদিন সকলকে খাওয়াইয়া দিতে হইবে। সেও বড় কম খরচ নয়। মেসে বিশ-পঁচিশ জন লোক থাকে। কিন্তু তাহারা অবুঝ নয়। বলিল,—তুমি যে ভাই, একটি ক'রে রসগোল্লা হাতে তুলে দেবে, সে হবেনা। আবার এতগুলি লোককে ভাল ক'রে খাওয়াতেও কম পড়বেনা। তার চেয়ে এক কাজ কর, মাংসের দামটা তুমি দাও, বাকী মেস থেকে দেওয়া হবে।

কৃত্তিবাস কথাটা একবার মনে-মনে তলাইয়া দেখিল। মাংসের দাম মানে অন্তত পক্ষে আটটি টাকা। পঁয়ত্রিশ থেকে আট গেলে থাকে সাতাশ। মেস খরচ পনেরো। এদিকে-ওদিকে আরও পাঁচটি টাকা যাবে। আর থাকে সাত। ওদিকে বাড়ীতে তাহার চাকুরী হওয়ার সংবাদ পাওয়ামাত্র ভাইদের কাছ হইতে নূতন পুস্তকের ফর্দ্দ আসিয়াছে। সেই বা কোন···সেই বা কোন ···পুস্তকের দামটা কৃত্তিবাস আন্দাজ করিতে পারিলনা।

কৃত্তিবাস বলিল, ভাই, এ মাসটা রেহাই দাও। আসছে মাসে নিশ্চয় খাওয়াব।

মেসের ছেলেরা ছাড়িল না। কহিল, এ মাসটায় অসুবিধে কি ?

হাত কচলাইয়া কৃত্তিবাস বলিল, টাকা নেই।

—টাকা আমরা ধার দিচ্ছি। তুমি আসছে মাসে দিয়ে দি'ও।

কৃত্তিবাস সোৎসাহে বলিল, রাজি। কিন্তু চারটি টাকার বেশী দিতে পারবনা।

মেসের ছেলেরা রাগিয়া বলিল, কাঙালী বিদেয় করতে এসেছ? ছ’-সাত টাকার কমে কিছুতে হতে পারবেনা।

কৃত্তিবাস হাতজোড় করিয়া বলিল, তাহলে ছ’টি টাকার মধ্যে কোনো রকমে সারো ভাই। আমার টাকার ভারী টানাটানি।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একজন কোমরে হাত দিয়া হেলিয়া-তুলিয়া হাসিয়া বলিল, এরই মধ্যে? বিয়েতো মোট একটি বচ্ছর ক’রেছ চাঁদ! দাঁড়াও ছেলেপুলে হোক, তবে তো মজা!

আর একজন তাহার চিবুকটা নাড়িয়া দিয়া বলিল, এদিকে একবার শ্বশুর বাড়ী যেতে যে এর দ্বিগুণ খরচ হয়ে যায়। সেটা বুঝি গায়ে লাগেনা, না?

কৃত্তিবাস ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসিল দুঃখে। বড়লোকের বাড়ীতে বিবাহ করার দুঃখ যে কত, ইহারা তাহার কী জানিবে? না গেলে ভাবিবে, জামাতা বাবাজীবন খরচের ভয়ে আসিতেছে না, আর গেলে খরচের ইয়ত্তা নাই। তত খরচ করা সত্যই তাহার পক্ষে অপরাধ। শ্বশুর বাড়ীর লোকের কাছেও তাহার সাংসারিক অবস্থা অজ্ঞাত নয়। যত খরচই করুক, কেহই তাহাকে যে বড়লোক বলিবেনা ইহাও সুনিশ্চিত। তবু সে না করিয়া পারেনা। মানুষ সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু বড়লোক আত্মীয়ের অবহেলা শেলের মতো বেঁধে।

পঁয়ত্রিশ টাকা মাহিনা। কৃত্তিবাস কখনও বসিয়া আকাশ-কুসুম রচনা করে, কখনও বা সংসারের কথা ভাবিয়া কোনো দিকে দিশা পায়না। কিন্তু ইহারই মধ্যে মেসে তাহার খাতির বাড়িয়া গেল। মেসের চাকর চোর অপবাদের ভয়ে বোকা সাজিয়া থাকে। কিন্তু কান সর্ব্বদা খাড়া করিয়া রাখে। সে পর্য্যন্ত টের পাইয়া গেল কৃত্তিবাসের চাকুরী হইয়াছে। আগে মুখে কিছু না বলিলেও কৃত্তিবাসের ফাই-ফরমাস এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিত। এখনও অবশ্য সাধিয়া করেনা, কিন্তু এড়াইয়াও চলেনা। জানে, প্রয়োজনের সময় হাত পাতিলে কিছু না কিছু বকশিস মিলিবে।

স্কুলে কৃত্তিবাস মন্দ ছেলে ছিল না। বরং ছাত্র ও মাষ্টার মহলে কিছু খাতিরই ছিল। তাহাদের গ্রামের অধিকাংশ ছেলে, —কেহ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ কোনো প্রকারে ডিঙাইয়াই, কেহ বা সেখানকার বন্ধ দরজায় নিষ্ফল আফশোষে মাথা ঠুকিয়া —মা সরস্বতীর নিকট হইতে বিদায় লয়। তেমন একখানি গ্রাম হইতে কৃত্তিবাস যখন কোথাও না ঠেকিয়া পর পর তিনটি পরীক্ষায় পাশ করিল, তখন গ্রামের অন্তত একদল লোক আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া মনে করিল, যাক, অতঃপর আর তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নিকট মাথা হেঁট করিবার কোনো কারণই রহিল না।

মেসে থাকিলে কৃত্তিবাসের মনটি থাকে ভালো। সেখানে তাহার চেয়ে অনেকে অনেক বেশী রোজগার করে সত্য, কিন্তু তাহারও কাহারও নিকট একটি পয়সা দেনা নাই। মাসের

পয়লা তারিখে মাহিনা পায়, সেই তারিখেই মেসের পাওনা পাই-পয়সা হিসাব করিয়া মিটাইয়া দেয়। যে যতই রোজগার করুক, মেসের মধ্যে সকলের যে অধিকার তাহারও তাই,—কাহারও চেয়ে এতটুকু কম নয়।

মেসে বসিয়া কৃত্তিবাস মনে বেশ জোর পায়। পরেশবাবু মেসের মধ্যে ভারিক্কি লোক। সকলেই তাঁহাকে খাতির করে। বয়সও হইয়াছে। সেই কোন্‌কালে পনেরো টাকা মাহিনায় কাজে ঢুকিয়া ছিলেন। সেকালে ওই অফিসে ঢুকিলে অবিবাহিতের বিবাহ হইত না,—কোনো ভদ্রলোক তাহার হাতে মেয়ে দিতে রাজি হইত না। তাহাই বাড়িয়া বাড়িয়া আজ দুই শত টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কত বি-এ, এম-এ তাঁহারই অধীনে কাজ করিয়া কৃতার্থ-বোধ করিতেছে। কিন্তু সেই পরেশ বাবুও কতদিন রাত্রে তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া যে কত দরখাস্ত, কত রিপোর্ট গোপনে লিখাইয়া লইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

পনেরো টাকা দুই শতে দাঁড়াইয়াছে। অথচ বিদ্যা তো ফিফ্‌থ ক্লাশ পর্য্যন্ত। কৃত্তিবাস ভাবে, সে বি-এ পাশ করিয়াছে। ঢুকিয়াছেও পনেরো টাকায় নয়, পঁয়ত্রিশে। দুই শত টাকা হইতে তাহার আর কত দিন! সেদিন তাহারও অমনি ভুঁড়ির উপর ভুঁড়ি নামিবে, মাথায় স্বল্প একটু টাকের মতো দেখা দিবে; —কিন্তু অমন কোঁচান ধুতির উপর কালো কোট গায়ে দিতে সে কিছুতেই পারিবে না, অমন ইস্ত্রি-বিহীন বেমানান প্যাণ্টালুনের সঙ্গে গলাবন্ধ কোটও নয়। তাহার চেয়ে গিলাকরা আদ্দির পাঞ্জাবী ঢের ভালো।

তাহার দেশের বাড়ী অবশ্য পাকা করিতে অনেক খরচ। সে আর এখন হয় না। কিন্তু কিছু মাহিনা বাড়িলেই ঘরের মেঝেগুলা সিমেণ্ট করাইতে হইবে। উঠানটাও পাকা না করিলে চলিবে না,—বর্ষাকালে যা পিছল হয়। বিশেষত বড়লোকের মেয়েটি তো দুইবেলা আছাড় না খাইয়া জলগ্রহণ করে না। সস্তায় পাইলে বাড়ীতে একটা টিউব-ওয়েলও বসাইতে হইবে। ম্যালেরিয়ার ভয় তো আছেই, তাহার উপর বর্ষাকালে দীঘি হইতে জল আনা তো একটা খুন-খারাপী ব্যাপার! কত মেয়ের যে পা ভাঙ্গিয়াছে, কোমরে খিল ধরিয়াছে, তাহার আর শেষ নাই।

এক সঙ্গে এতগুলি ব্যাপার অবশ্য কম ব্যয়সাধ্য নয়। সে হইবেও না। টুক টুক করিয়া দুই তিন বৎসরের মধ্যে একে একে করিতে হইবে। তাহা হইলেই আর গায়ে লাগিবে না।

কিন্তু এসবও দেরী আছে। আপাতত মায়ের গহনাগুলি খালাস করিতেই হইবে। তার পর যা থাকে কপালে! সুদে-আসলে যে কত হইল, তাহাই বা কে জানে! আহা! তাহার জগদ্ধাত্রীর মতো মা, শুধু তাহারই মুখ চাহিয়া খালি হাতে বেড়াইতেছেন!

সেটা ছাড়াইতে হইবে, আর দত্তদের বাড়ীর দেনা। লোকে বলে, দত্তদের বাড়ীতে একবার হ্যাণ্ডনোট কাটিলে, তাহা আর সাত পুরুষেও শোধ করা যায় না। গোবর্দ্ধন ঘোষ বলে, ছা'এ মা গিলবে! ছা'এর মা গেলাই বটে! গোবর্দ্ধন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তবে টের পাইয়াছে। যতদিন না সুদ আসলের সমান হইতেছে, ততদিন দত্তরা বিশেষ তাগাদা করে না। মাঝে মাঝে বিনা

টাকাতেই তামাদি বন্ধ করার জন্য উশুল দিয়া লইয়া যায়। যেই সুদে-আসলে সমান হয়, অমনি তাগাদা, তাগাদার পর তাগাদা। সে অবস্থায় মানুষ হাত পাতিয়া বিষ লইয়া ভক্ষণ করিতে পারে,—নূতন হ্যাণ্ডনোট কাটা তো তুচ্ছ কথা। এমনি করিয়া হ্যাণ্ড-নোটের পর হ্যাণ্ডনোট,—সুদের সুদ, তস্য সুদ। গৃহস্থের আর থাকিবে কি? আগে দত্তদের দেনা শোধ, তার পর অন্য কাজ।

কিন্তু তারও আগে আর একটা খরচ আছে।

কৃত্তিবাসের বাবা চিঠি লিখিয়াছেন: "আমার মা-লক্ষ্মীকে নিতে লোক আসিবে দশই মাঘ। পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাহার ছোট ভাইটির অন্নপ্রাশন। না পাঠাইলে বৈবাহিক মহাশয় বড়ই দুঃখ করিবেন। সে কারণ পাঠানোই সাব্যস্ত করিলাম। তুমি তৎপূর্ব্বে স্বয়ং আসিয়া কিম্বা লোক-মারফৎ একজোড়া শাড়ী এবং একখানি গামছা অবশ্য করিয়া পাঠাইবে। বোধ করি তোমাকেও যাইবার জন্য তাঁহারা পত্র লিখিয়াছেন। ছুটি পাইলে তুমি নিজেও একবার যাইবার চেষ্টা করিও। লোকে যেদিন হইতে কলিকাতায় চাকুরী করা আরম্ভ করিয়াছে সেদিন হইতেই কুটুম্বিতা, আত্মীয়তা, মানুষের বাড়ীতে মানুষের যাওয়া আসাও কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমি এ সকল ভালো লক্ষণ মনে করি না। তুমি ছুটির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে এবং অসম্ভব না হইলে নিশ্চয়ই যাইবে।"

ব্যস, তিনি তো লিখিয়া খালাস, কিন্তু ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কটা তো এখনও কৃত্তিবাসের হাতে আসে নাই। আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা, মানুষের বাড়ীতে মানুষের যাওয়া-আসা খুবই যে ভালো জিনিস

সে বিষয়ে তাহার নিজেরও সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বাজারে এ সকল করিতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা কই? 'মা-লক্ষ্মীর' জন্য একজোড়া শাড়ী কাপড় এবং একখানি গামছা কিনিতে হইবে, সংসার খরচের জন্য যাহা নিয়মিত তাহাকে দিতে হয় তাহার এক পাই কম হইলে চলিবে না, এগুলি পৌঁছাইয়া দিবার জন্য বাড়ী যাইতে হইলেও খরচ আছে,—ট্রেণ ভাড়া তো আছেই, তাহার উপর বাড়ী আর কিছু শুধু হাতে যাওয়া যায় না। অথচ সম্বলের মধ্যে ওই পঁয়ত্রিশ টাকা।

শুধু তাই নয়,—কৃত্তিবাস মনে মনেই হাসিল,—'মা-লক্ষ্মী' গেলে বোধ হয় তাহার পলিত-কেশ সন্তানটিও সঙ্গে যাইবে। ট্রেণে চড়িবার নাম শুনিলে কৃত্তিবাসের পিতার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। পাড়াগাঁয়ের কুণো মানুষ, কোথাও কখনও বাহির হন নাই। বিদেশে-বিভূঁয়ে যাইতে তিনি পারেনও না, ভালোও বাসেন না। সেজন্য বড় একটা কোথাও যানও না। কিন্তু কণিকা তাঁহাকে কেমন করিয়া না জানি গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। সে কাছে বসিয়া গল্প না করিলে তাঁহার খাওয়া হয় না, নিজের হাতে বিছানা পাতিয়া না দিলে শোয়া হয় না। কখন তাঁহার পানের দরকার, কখন তাঁহার তামাকের দরকার একথা কণিকা ছাড়া আর কেহ জানেও না, বোঝেও না। সেজন্য এক মাসের উপর দুই মাস সে বাপের বাড়ী গেলে বৃদ্ধ সন্তানটিও একদিন তালতলার চটি-জোড়া ঝাড়িয়া মুছিয়া ছাতি বগলে, বাঁকা লাঠি হাতে ঠুক ঠুক করিয়া বেহাই-বাড়ী গিয়া উপস্থিত হন। সেই অপরূপ সজ্জা দেখিয়া বেহাই-বেয়ান ঠাট্টা করেন, আত্মীয়েরা

সবিস্ময়ে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। কিন্তু কৃত্তিবাসের পিতা সে পরিহাস কানেও করেন না। বোধ করি বুঝিতেও পারেন না পরিহাসের বিষয়টা কোথায়। তিনি একেবারে অন্দরের উঠানে দাঁড়াইয়া হাঁকেন,—

আমার মা-লক্ষ্মী কই গো?

কণিকা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে। আনন্দে তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। সেই সঙ্গে পিতামাতার শ্লেষপূর্ণ পরিহাসে রাগে ও লজ্জায় তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া যায়। কিন্তু তখন তাহার কোনো দিকে লক্ষ্য করার সময় নয়। আলু-থালু কেশে নিজের হাতে গাড়ু লইয়া খিড়কীর পুকুর হইতে জল আনিতে ছোটে।

আড়াল হইতে তাহার মা তীব্র চাপা কণ্ঠে হাঁকেন, ওলো শ্বশুরের সামনে অমন ক'রে ছুটিসনা। মাথায় কাপড় দে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

বেয়ান বেয়াইকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলেন, আ ম'লো! মেয়েটা নিজেই চললো নাকি জল আনতে? অতগুলো চাকর সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পেলে না?

কথাটা তিনি বাড়াইয়া বলেন নাই। সত্যই গোটা দুই চাকর তখন উঠানে দাঁড়াইয়া বড়দিদিমণির শ্বশুরের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিল। গিন্নিমার তিরস্কারে তাহারা কি করিবে ভাবিতে না ভাবিতে কণিকা নিজেই জল লইয়া উপস্থিত হইল। নিজের হাতে হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলা ধুইয়া গামছা দিয়া মুছাইয়া দিল। তারপর কাছে বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিল,—যেন কতকাল পরে দুজনের দেখা!

কণিকা যেন একটি ঝাড় ফুলের গাছ। একটুখানি হাওয়া দিলেই ঝরঝর করিয়া অজস্রধারায় কেবলই হাসি ঝরিয়া পড়ে।

এমনি কণিকা।

বড়লোকের মেয়ে বলিয়া কোনো অহঙ্কার নাই। শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামী দেবরের কাছে অপর্য্যাপ্ত স্নেহ পাইয়া ফলভারাতুর বৃন্তের মতো তাহার সমস্ত মন অবনত হইয়াই আছে। এমনি কণিকা। তাহার কথা ভাবিতেও কৃত্তিবাসের মন পুলকিত হইয়া ওঠে।

যে তারিখে কণিকার যাওয়ার কথা ঠিক সেই সময়টাতেই রবিবার সরস্বতী পূজা ও ঈদ মিলিয়া কয়েকটা দিন ছুটির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। টাকা খরচের কথা ভাবিয়া কৃত্তিবাস বাড়ী যাইবে কিনা স্থির করিতে পারিতেছিলনা। ইত্যবসরে তাহার পিতার পত্র ও তার পরের দিনই কণিকার পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

কণিকা লিখিয়াছে তিনছত্র।

লিখিয়াছে: "কতকাল তুমি বাড়ী আস নাই হিসাব করিয়া দেখিও। দশই মাঘ তোমার আপদ বিদায় হইতেছে। হয়তো এরপর ঘন-ঘনই বাড়ী আসিবে। আর বাধা কি বল? বাবা আমাকে বাপের বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিয়াছেন। তুমিও নিশ্চয়ই দিবে। তোমার তো ভালই হইল।"

কণিকা চটিয়াছে,—অভিমানিনী কণিকা! বাপের বাড়ী যাইতে সে ভালবাসে না। গেলেও দিন কয়েক পরেই লইয়া যাইবার জন্য ঘন ঘন তাগিদ দেয়। কিন্তু যাহার জন্য শ্বশুরালয় মেয়েদের কাছে মধুময় হয় তাহারই বা দেখা পায় কই! সে তো

কেবলই ওজরের পর ওজর করিয়া তাহার সকাতর মিনতি এড়াইয়া চলে। কণিকা চটিয়াছে।

কৃত্তিবাস ভাবিয়া দেখিল, আর ওজর করা চলেনা। একসঙ্গে একটা মোটা খরচ হইবে, তা আর কি করা যায়! সংসারে থাকিতে গেলে···

মোটা খরচ বই কি! সামান্য বেতনের কেরাণীর পক্ষে একসঙ্গে দশটা টাকা তো কম নয়। অথচ কণিকা অভিমান করিয়াছে। যাওয়ার পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে একবার দেখা না করিলে সে তো কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ বাধাইবে। যা জেদী মেয়ে,—বাপের বাড়ীর লোকের সুমুখেই শেষ মুহূর্ত্তে হয়তো বাঁকিয়া বসিবে। শেষ মুহূর্ত্তে হয়তো স্পষ্ট বলিয়া দিবে, সে বাপের বাড়ী যাইবেনা। কণিকার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

কৃত্তিবাস যখন দেশের ষ্টেশনে পৌঁছিল তখন রাত্রি আটটার বেশী নয়। শীতকালের রাত্রি বলিয়াই যা, নইলে রাত আর এমন বেশী কি? তবে শনিবারের রাত্রি,—তাহার উপর বড় একটা ছুটি। সুতরাং লোক ছিল বিস্তর। আলোও জুটিয়া গেল অনেকগুলি। কিন্তু মুস্কিল হইল মোট পোঁটলাগুলি লইয়া।

সেও বড় কম নয়। সের পাঁচেক সোণামুগের ডাল, সকল প্রকারের মসলা কিছু কিছু করিয়া, থানকয়েক কাপড়, গোটা চারেক ফুলকপি, গোটা চারেক বাঁধাকপি, কিছু মটরশুটি, নূতন

গোল আলুও আছে,—এমনি করিয়া টুকি টাকিতে জিনিসের ওজন আধ মণের উপর। ষ্টেশনে কুলি যে পাওয়া যায় না তা নয়। কিন্তু এই শীতের রাত্রে সে চার গণ্ডা পয়সার কম ছাড়িবে না। তাহার উপর রাত্রে হয়তো আর ফিরিতেও রাজী হইবেনা, নৈশ ভোজনটাও সারিবে। এই সমস্ত অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কৃত্তিবাস মাইল দুই পথ নিজেই মোট মাথায় করিয়া চলিয়া যাইবে স্থির করিল। রাত্রে কে আর দেখিতে যাইতেছে।

সঙ্গে ছিল বিমলকান্তি। সে আপত্তি করিয়াছিল। কিছু মাল তাহার সঙ্গেও ছিল। সে পরামর্শ দিয়াছিল, দু'জনে মিলিয়া ভাগে একটা কুলি করিতে। অবশ্য একজনের পক্ষে মোট কিছু বেশী হইবে। কিন্তু তেমনই মজুরীও লইবে ছয়আনা। কৃত্তিবাস তাহাতেও রাজী হইলনা। কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য জিনিসপত্র কিনিয়া তাহার হাতে অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। চারি আনা পয়সাও তাহার কাছে মূল্যবান।

সে কাপড় ও মশলার মোটটা কাঁধে ফেলিয়া দুইহাতে কপিগুলি ঝুলাইয়া লইয়া বলিল, কিসের কুলি! তুমিও যেমন! এইটুকু তো পথ। দিব্যি নিয়ে যাব। তোল, তোল,—তোমার আর ক'টাই বা জিনিস। অত নবাবীতে কাজ নেই!

অগত্যা বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণভাবে বিমলকেও তাহার নিজের মোট ঘাড়ে করিতে হইল। সে অবশ্য বেশী কিছু নয়। কৃত্তিবাসের তুলনায় অতি সামান্য। তবু অনভ্যাসের জন্য কষ্ট হইতেছিল। মিনিট পাঁচেক চলিবার পর হইতেই তাহার কাঁধে ব্যথা হইতে লাগিল এবং কপি-বাঁধা দড়ি আঙ্গুলে বসিয়া টনটন করিতে লাগিল। কিন্তু

ইত্যবসরে কৃত্তিবাসের একটা সুযোগ মিলিয়া গেল। তাহাদেরই পাড়ার কয়েকটি ছেলে কাছেই কোথাও গিয়াছিল, এই ট্রেণেই ফেরে। তাহারা আগেই নামিয়া পথ চলিতেছিল। কৃত্তিবাস একটু গিয়াই তাহাদের সঙ্গ ধরিল। তাহারা প্রায় শুধু হাতেই যাইতেছিল। কৃত্তিবাস একটু খোসামোদ করিয়া এক একটা কপি এক একজনের হাতে চালান করিয়া দিয়া হাত হালকা করিয়া ফেলিল।

বিমল আপন মনেই পথ চলিতেছিল। কৃত্তিবাসের কাণ্ড খেয়াল করে নাই। অনেকক্ষণ পরে কি একটা কথা বলিতে গিয়া পিছন ফিরিতেই দেখিল কৃত্তিবাস নাই। এতটা পথ সে বিনা আলোকে একাই চলিয়া আসিয়াছে, আলোগুলি সবই পিছনে। ঘাড়ও বোঝার ভারে ব্যথা করিতেছিল। সেগুলা নামাইয়া রেল লাইনের উপরই একটু বসিল। একটু পরে তাহারাও আসিয়া উপস্থিত হইতেই বিমল লক্ষ্য করিল কৃত্তিবাসের হাতে কিছুই নাই। একটি মাত্র মোট কাঁধে ফেলিয়া সে মজা করিয়া হাঁটিতেছে।

—তোমার কপি কি হ'ল হে?

কৃত্তিবাস হাসিয়া চুপি চুপি বলিল, ছেলেগুলোর হাতে গছিয়েছি।

মজা মন্দ নয়তো! কৃত্তিবাস পয়সা খরচের ভয়ে কুলি করিলনা। এখন পরের ছেলের মাথায় মোট চাপাইয়া দিয়া বেশ আরামেই আসিতেছে।

বিমল মনে মনে হাসিয়া বলিল,—ভালো ক'রেছ। ছেলেগুলো সবাই বেশ ভালো ছেলে। একটু পরে শুধু কপির ডাঁটাটা

তোমার হাতে দিয়ে সরে পড়বে। অমন চোর আর আছে নাকি!

ছেলেগুলিকে কৃত্তিবাসও যে জানেনা তাহা নয়। বিমল মিছে বলে নাই। তাহার আর খালিহাতে আরাম করিয়া আসা হইল না। ছেলেগুলা একটু পিছনে নিজেদের মধ্যে কি কলরব করিতে করিতে আসিতেছিল।

কৃত্তিবাস তাহাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া চিন্তিতমুখে কহিল, ভালো মনে পড়িয়ে দিয়েছ। হতভাগারা ইতিমধ্যেই অর্দ্ধেক সাবাড় করলে কি না কে জানে।

ছেলেগুলি আসিতেই কৃত্তিবাস আগ বাড়াইয়া তাহাদের হাত হইতে কপি কয়টা লইয়া বলিল, দে, আর তোদের নিয়ে যেতে হবেনা। অনেকটা এসেছিস।

পরের মোট বহিয়া আনিতে ছেলেগুলির বিরক্তি বোধ হইতেছিল। তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে কপিগুলি দিয়া দিল। কপির কয়েকটা ফুল কিম্বা কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া লইয়াছে কি না ভগবান জানেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের মনে হইল সেগুলির ওজন যেন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

বাড়ী পৌঁছিয়া ঘাড়ের এবং হাতের মোট দুম করিয়া নামাইয়া কৃত্তিবাস একেবারে পা ছড়াইয়া বসিল। ঘাড় তাহার টনটন করিতেছে এবং দুই হাতই অসাড় হইয়া গিয়াছে।

মা গালে হাত দিয়া বলিলেন, আহা, অতবড় মোট তুই নিজেই নিয়ে এলি কৃত্তিবাস! একটা কুলি করলেও তো পারতিস। এতখানি পথ ওই মোট নিয়ে আসা!

কৃত্তিবাস কিছুই বলিল না। শুধু পা দুলাইয়া একটুখানি ফিকা হাসিল।

মা পাশে বসিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ম্লানকণ্ঠে বলিলেন, জীবনে কখনো কুটো ভেঙ্গে দুটো করলিনে বাবা, আর ওই মোট তুই নিজে নিয়ে এলি?

ছোট বোনটি একটি ঘটিতে করিয়া জল গরম করিয়া লইয়া আসিল। কহিল, পা ধোবার জল রইল, দাদা।

গরম জলে পা ধুইয়া কৃত্তিবাস কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিল। বলিল, রাত্রে আমাকে শুধু একটু দুধ দিও মা, আর কিছু খাবনা।

—সে কি রে? সেই কখন খেয়ে বেরিয়েছিস! দু'টি ভাত না খেলে হয়!

—না মা, আর কিছু নয়। ক্ষিধে মোটে নেই। গা-মাথা ঘুরছে।

মা বিরক্তভাবে কহিলেন, ওই তো তোর দোষ বাছা, খাবিনে কিছুতে। শরীর টেঁকবে কি করে?

মা বক্‌বক্ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। কৃত্তিবাস এখনও পর্য্যন্ত পিছনে চাহে নাই। কিন্তু না চাহিয়াও টের পাইতেছিল, কণিকা তাহারই আশে পাশে পিছনে আড়ালে আড়ালে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এখন মনে হইল, শাড়ীর খস খস শব্দটা সিঁড়ির

দিক হইতেই আসিতেছে। সেদিকে দৃষ্টি পড়িতে অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা গেলনা। শুধু মনে হইল, শাড়ীর প্রান্তের মত কি একটা অন্ধকারে দুলিতেছিল, সে ঘাড় ফিরাইতে তাহা সরিয়া গেল। কৃত্তিবাস ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিয়া উপরে গেল।

তাহার শয়ন কক্ষের দ্বার ঠেলিতেই নজরে পড়িল, কণিকা একমনে ঘাড় হেঁট করিয়া পরিষ্কৃত শয্যা সুপরিষ্কৃত করিতেছে। দ্বার খোলার শব্দেও যখন সে পিছন ফিরিয়া চাহিল না, তখন তাহার দৃষ্টিপাতের অপেক্ষায় দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকা মিথ্যা। কৃত্তিবাস সহাস্যমুখে তাহার সম্মুখের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তবু কণিকার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হইলনা।

কৃত্তিবাস গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে কহিল, আসামীর সেলাম পৌঁছে।

সেকথা যেন কণিকার কানেই গেলনা। কে যেন কাহাকে কথা বলিল। সে বিছানা পরিষ্কার করা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কৃত্তিবাস অমনি খপ্ করিয়া তাহার বাঁ হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, এত রাগ ?

কণিকা একটা ঝাপ্টা দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, যাও তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলোনা। ভারি ভালবাসো! লজ্জা করে না!

বলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কৃত্তিবাস পাশ ফিরিয়া শুইল। সে জানে, এসময় প্রতিবাদ করা নিষ্ফল। প্রতিবাদ করিবেই বা কিসের! সে ভালোবাসে কি না বাসে, এও কি কণিকার কাছে প্রতিদিন নূতন করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে? কেরাণীর জীবনে,

বসন্ত তো সমারোহ করিয়া আসেনা,—আসে ম্লান সন্ধ্যার মতো অবনত মুখে। মনের ফুলবনে প্রতিদিন নূতন নূতন ফুল ফোটার আনন্দও নাই। কোনোদিন ফুল ফোটে, কোনোদিন দুশ্চিন্তার তাপে কুঁড়িতেই শুকাইয়া যায়। ইহার আর উপায় কি ?

কৃত্তিবাসের বোন একটুখানি গরম দুধ আনিল। একটি পান মুখে দিয়া সে আবার শুইয়া পড়িল। কতক্ষণইবা হইবে! সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ও বেদনায় দেখিতে দেখিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল।

তার অনেক পরে আসিল কণিকা। কৃত্তিবাসের একটি পা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া তাহাতে তেল মাখাইতে বসিল। কিন্তু কৃত্তিবাস আর চোখ মেলেনা। তাহার নাক ডাকিতেছে। কণিকা তাহার পায়ের বুড়া আঙুলটা কয়েকবার টানিল। তাহাতেও সে চোখ মেলিলনা দেখিয়া, পা ধরিয়া জোরে জোরে নাড়া দিল। কিন্তু কৃত্তিবাস তখন গভীর ঘুমে অচৈতন্য। রাগে, দুঃখে, অভিমানে কণিকার চোখ জ্বালা করিয়া উঠিল। সে কোলের উপর হইতে স্বামীর পা দুইটি নামাইয়া দিয়া সেইখানেই উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। এই তাহার স্বামী! তিন মাস পরে এই তাহার সঙ্গে সম্ভাষণ! এ জীবনে ইহাই তাহার পাথেয়!

ঘুমের ঘোরে কৃত্তিবাস একবার পাশ ফিরিল। সে তখন স্বপ্ন দেখিতেছিল, কি একটা লেবেল লেখা ভুল হইয়াছে বলিয়া সাহেব তাহাকে ভীষণ ধমক দিতেছে। ভয়ে শীতের রাত্রেও সে ঘামিয়া উঠিল।

নিবারণের মৃত্যু

রেল লাইন থেকেই দেখা যায় কতককগুলি ছোট-বড় গাছের আড়ালে একখানি ভাঙা বাড়ী, সামনে ছোট্ট একটি ডোবা। বাড়ীর চারিদিকে ঘেঁটু, আশ-শ্যাওড়া আরও কত কিসের ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গল। বাড়ীর ইট বেরিয়ে পড়েছে। নোণা-ধরা দেওয়াল স্থানে স্থানে এত ক্ষয়ে গেছে যে, কি ক'রে অমন বাড়ীতে মানুষ থাকে ভাবতে বিস্ময় লাগে। বাড়ীর চারিদিকের পাঁচীল মাঝে মাঝে ভেঙে গেছে। তার ফাঁক দিয়ে অন্দরের উঠোন পর্য্যন্ত দেখা যায়। খোয়া-ওঠা উঠান। তার এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত তার ঝোলানো। তাতে কয়েকখানা ছেঁড়া কাঁথা, ভিজে কাপড় ঝুলছে। ওইতেই অন্দরের মর্য্যাদা রক্ষিত হচ্ছে।

ডোবার বাঁধাঘাটের অবস্থাও সমান শোচনীয়। অন্ধকারে পা না ভেঙে নামা অসম্ভব। কিন্তু ওদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে একটা ছোট ছেলেও চোখ বুঁজে নামতে পারে। এই ঘাটটিই এ পাড়ার খিড়কি। ছোট ছোট পানায় তার জল এমন নীল হয়ে গেছে যে ছুঁতেও ঘৃণা হয়।

সকাল বেলা। সবে সূর্য্য উঠেছে। একটি বৃদ্ধা বিধবা ঘাটের পৈঠায় বসে তামাকের গুল দিয়ে যে ক'টি দাঁত এখনও অবশিষ্ট আছে সেই ক'টি সযত্নে মার্জ্জিত করছিল। আর একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোক মাথায় আধ-ঘোমটা টেনে ঘাটের অপর প্রান্তে ঘাড় হেঁট ক'রে নিঃশব্দে বাসন মাজছিল। চারিদিকে গাছের ঝিমিয়ে-আসা পাতায় কেমন একটা স্তব্ধতা এসেছে। তারই বিষণ্ণ ছায়া পড়েছে ডোবার নিস্তরঙ্গ নীল জলে।

একটি বউ ভাঙা বাড়ী থেকে মন্থরপদে বেরিয়ে এসে ঘাটের

মাথায় মুখ ঢেকে থমকে দাঁড়াল। কতই বা তার বয়স হবে? কুড়ি-একুশ, কি তারও কম। ছিপছিপে শরীর, কিন্তু তারও বাঁধন যেন আলগা হয়ে পড়েছে। গাছ থেকে লতার বাঁধন আলগা হয়ে গেলে লতার যে অবস্থা হয় তেমনি। যেন এলিয়ে এলিয়ে পড়ছে। বউটি মুখ ঢেকে দাঁড়াল। ঘাটের এই দুটি মেয়ের কাছে মুখ দেখাতে তার ইচ্ছে করছে না। তার কচি ঘাসের মতো রঙের লাবণ্য যেন কোথায় উবে গেছে। কোমল ত্বকে কর্কশতা এসেছে। মুখে কলঙ্ক রেখা দেখা দিয়েছে। চোখে জল নেই বটে, কিন্তু লাল—রক্তের মতো লাল। আর তার ঘন পল্লবে বিশ্বের শ্রান্তির ছায়া এসেছে ঘনিয়ে। তারই ওপর মাথার রুখু চুলগুলি বারে বারে উড়ে উড়ে এসে পড়ছে। চোখের কোণে রাত্রি জাগরণের কালিমা।

বউটি ঘাটের মাথায় থমকে দাঁড়াল। পরিচিত মানুষের সামনে তার পা যেন চলতে চাইছে না। কিন্তু তবু থমকে দাঁড়ালে চলবে না। দিনের সব কাজই তার বাকি। বুড়ী শাশুড়ীর কাল থেকে কোমর যেন ভেঙে গেছে। আর উঠতে পারছেন না। স্তিমিত দৃষ্টি চোখের জলে অন্ধ হবার উপক্রম। তবু কান্নার এখনই হয়েছে কি? বলতে গেলে এখনও তো সুরুই হয় নি! এখনও মানুষটির শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে, চোখ মেলে চাইছে, অতি কষ্টে দুয়েকটি কথাও বলছে। কিন্তু আর বোধ হয় বেশীক্ষণ নয়। হয় তো আজ দুপুরেই নিশ্বাস থেমে যাবে, চোখ মেলে চাওয়াও হবে শেষ। ডাক্তার মুখে কিছু বলেন নি বটে, কিন্তু তাঁর মুখ চোখ দেখে বুঝতে আর কারও বাকি নেই। হয়তো দুপুরেই,

কিম্বা বড় জোর সন্ধ্যায়। তার বেশী নয়। কান্নার সুরু হবে তখন। তখন থেকে সমস্ত জীবন-ভোর। সমস্ত জীবন-ভোর··· সমস্ত জীবন-ভোর·· সমস্ত জীবন-ভোর···

এর বেশী তরুবালা আর ভাবতে পারে না। একটি জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তারই সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত বাকি জীবনগুলি সমানে চলতে থাকবে—এ যেন বিশ্বাস করার মতো কথা নয়। যাকে প্রত্যহ দেখছি, যার অস্তিত্ব প্রত্যেক মুহূর্ত্তে অনুভব করছি, অকস্মাৎ একটি বিশেষ মুহূর্ত্তের পরে তাকে আর কোথাও দেখা যাবে না—একথা ভাবতে গেলেও মন হু হু করে, মাথা ঝিম ঝিম ক'রে ওঠে, অকস্মাৎ পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে গিয়ে সমস্ত মন বিস্বাদ ঔদাসিন্যে পরিপূর্ণ হয়। জীবনের যেন আর কোনো মানেই থাকে না।

যে বৃদ্ধা পিছন ফিরে দন্তধাবন করছিল তরুবালাকে সে লক্ষ্য করে নি। তরুবালা তখন ঘাটের শেষ পৈঠায় পৌছেছে। যে মেয়েটি বাসন মাজছিল সে যেন তরুবালাকে দেখে সমীহ ক'রে একটু স'রে বসল। বৃদ্ধার দৃষ্টিও তার ওপর পড়তে সেও অপ্রয়োজনে একটু স'রে গেল। সবাই জানে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই এই বধূটির দুঃখে বনের পাখীও কেঁদে উঠবে। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। এই অল্প সময়টুকু কেউ তাকে কোনো দুঃখ দিতে চায় না। এই ঘাটেই বাসন মাজা নিয়ে কত জনের সঙ্গে কত কলহই না হয়ে গেছে। ছোট ঘাট। তিন জন নামলেই চতুর্থ জনের আর পা ফেলবার জায়গা থাকে না। তাকে বাসনের গোছা হাতে ক'রে ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। কোথায়

কে পৈঠার ওপর চিবোনো ডাঁটা ফেলে গেছে; কার পাতের ভাত ঘাটের কোণে জড় হয়ে আছে, ফেলে দিতে মনে নেই; কার এঁটো বাসনে কারও পা ঠেকেছে, এই অবেলায় নেয়ে মরতে হবে; কলহের কারণের কি অভাব আছে? কিন্তু সে সব আজ নয়, বিশেষ ক'রে এই বধূটির সঙ্গে কিছুতে নয়। ওর সিঁথির সিন্দুর এখনও জ্বল জ্বল করছে বটে, কিন্তু সে সিন্দূর চিহ্নের দিকে চাওয়া যায় না। সে যেন ওর সিঁথিকেই বিদ্রূপ করছে—মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপ। যে সীমন্তিনীর সকল গৌরব আর কিছু পরেই পথের ধুলোয় মিলিয়ে যাবে তাকে প্রতিবেশিনীরা সকল গৌরব নিঃশেষ ক'রে আজকেই মিটিয়ে দিতে চায়। যাকে ক'দিন আগে তারা গ্রাহ্যই করেনি, আজ তাকেই দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলে।

বউটি সসঙ্কোচে ঘাটে নামল।

—নিবারণ কেমন আছে বৌমা?

বৃদ্ধা একবার গলাটা ঝেড়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে।

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার কিছু নেই। নিবারণের অবস্থা কাল রাত থেকেই খুব খারাপ। ভালো লক্ষণ যা ছিল একটি একটি ক'রে সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। আশা করার মতো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। বৌমা উত্তর দিলে না। নিঃশব্দে মাথাটা নেড়ে ডান হাত দিয়ে ললাটের চুলগুলি সরিয়ে ফেললে। এই ক'দিনের রোগী-সেবায় আর দুর্ভাবনায় তার শরীর আধখানা হয়ে গেছে। শীর্ণ করপ্রকোষ্ঠে চুড়ি দু'গাছি ঢল ঢল করছে। ওই দু'গাছি সরু চুড়িই আজ তার সম্বল। চিকিৎসার ব্যয়

নির্ব্বাহের পর তার গায়ের গহনা অবশেষে ওই দু'গাছিতে এসে ঠেকেছে।

প্রতিবেশিনীরা সহানুভূতিসূচক দীর্ঘশ্বাস ফেললে। কাজ তাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে চলে গেল।

ফাল্গুনের শেষ। জলে এখনও শীত রয়েছে বেশ।

এই ডোবায় নামলে চারিদিকের উঁচু পাড় বাইরের পৃথিবীকে দৃষ্টির আড়ালে রাখে। অকস্মাৎ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তরুবালা যেন বেঁচে গেল। মুমূর্ষু রোগীর অস্ফুট আর্ত্তনাদ, পাণ্ডুর চোখের কাতর দৃষ্টি, শিশুপুত্রের কখনও দাপাদাপি কখনও চীৎকার, বৃদ্ধা শাশুড়ীর ভাষাহীন বিহ্বল দৃষ্টি—জরা-মৃত্যু-ব্যাধিগ্রস্ত বিপুল পৃথ্বী তার সমস্ত কুশ্রীতা নিয়ে এই গোষ্পদের সুগভীর নির্জ্জনতায় তলিয়ে গেল।

তরুবালা মুখ ধোবার জন্যে ঘাটে এসেছিল। তার এখনও অনেক কাজ। সমস্ত রাত ছটফট ক'রে এখন একটু নিস্তেজ হয়ে স্বামী ঝিমুচ্ছে। এখনই উঠবে বোধ হয়। কাছে কেউ নেই। সমস্ত রাত্রি জেগে শাশুড়ী ওঘরে এলিয়ে পড়েছেন। ছেলেটা সকালে উঠে পূজোর রঙীন পাঞ্জাবীটা গায়ে দেবার জন্যে বেজায় ঝোঁক ধরেছিল। সেটা বের ক'রে দিতেই ছুটতে ছুটতে পাড়ায় বেরিয়ে গেছে। স্বামীর কাছে কেউই নেই। রোগীর ঘুম, হয়তো এখনই উঠে পড়বে। তাকে ওষুধ দিতে হবে। একটুখানি বেদানার রস ক'রে খাওয়াতে হবে। গায়ের ঢাকাটা খুলে গিয়ে থাকলে আবার ভালো ক'রে গায়ে দিয়ে দিতে হবে। কত কাজ। ছেলেটা একটু পরেই ফিরবে। গয়লা দুধ দিয়ে

গেছে, সেটুকু গরম ক'রে রাখতে হবে। নইলে ক্ষুধায় ছেলেটা কাঁদবে। কাল শাশুড়ীর একাদশী গেছে। তাঁর দ্বাদশীর ব্যবস্থা করতে হবে। আর নিজের জন্যে না হ'লেও ওদের তুজনের জন্যেও তো তুটো ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিতে হবে। মাত্র একটি মানুষেরই জীবনের তেল ফুরিয়ে এসেছে। পৃথিবীর গতি তো আর বন্ধ হয় নি! যে যাবে সে যাবে, যারা থাকবে তাদের খেতেও হবে, খাটতেও হবে, সবই করতে হবে।

তরুবালার অনেক কাজ।···

কিন্তু ডোবার ঠাণ্ডা জল তাকে লোভ দেখাচ্ছে। সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করছে। উনিশ-কুড়ি বছরের তরুবালা আর পারে না। সে আকণ্ঠ জলে ডুবিয়ে এই সুশীতল একাকিত্বে যেন মজে গেল। বাইরের পৃথিবীর কিছুই আর খেয়াল রইল না।

খেয়াল রইল না রুগ্ন স্বামীর মুখ, শাশুড়ীর একাদশী-পর্ব্ব, ক্ষুধার্ত্ত শিশুর কাতরতা, ঘর-কন্নার আরও সহস্রবিধ খুঁটিনাটি।

খেয়াল রইল না নিজের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী অসংখ্য তুঃখ-দারিদ্র্য ও জীবন সংগ্রামের তুর্ভাবনা: বুড়ী শাশুড়ী মরি-মরি ক'রেও আরও কতকাল বাঁচবেন কে জানে, কে জানে সে নিজেই কতকালের পরমায়ু নিয়ে এসেছে; ছোট ছেলে একদিন বড় হবে, তাকে মানুষ করতে হবে—কিন্তু সে পরের কথা পরে, আপাততঃ এই তিনটি প্রাণীর দৈনন্দিন তুবেলা তুটি গ্রাসের অন্ন কে জোগাবে সেই তো সমস্যা।

কিন্তু তরুবালা আর ভাবতে পারে না। গত পনেরো দিন ধ'রে সে কেবলই ভাবছে, কেবলই ভাবছে। ভেবে ভেবে তার দেহ-মন

ভেঙে গেছে, মস্তিষ্কের ভাববার শক্তি লোপ পেয়েছে। একটু সে বিশ্রাম চায়। একটু বিস্মৃতি।

ডোবার নীল জল কন্‌কনে ঠাণ্ডা। উঁচু পাড়ের আড়ালে পৃথিবীতে চলেছে ভাঙা-গড়ার খেলা—অবিশ্রান্ত। ঝোপে ঝোপে ক'টি পাখী তুলেছে নিরবচ্ছিন্ন কূজন। তরুবালার সব ভুল হয়ে গেল···

সে ডোবার জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে মুখ দিয়ে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে আপন মনে খেলা করতে লাগল।

নিবারণ মস্ত বড় লোক নয়। সে মারা গেলে তার নিজের নিভৃত কোণটি ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা যাবে না। না বেরুবে খবরের কাগজে ছবি, না লেখা হবে ইনিয়ে-বিনিয়ে সত্যি-মিথ্যে নানা রকম শ্রদ্ধাঞ্জলি। এক যদি কোনো বড়লোকের মোটর চাপা প'ড়ে মরতে পারত, কিম্বা পুলিশের গুলিতে, তাহ'লেও হ'ত। কিন্তু সে মরছে নিতান্ত মামুলি ধরণে—দীর্ঘকাল ধ'রে রোগে ভুগে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে—আরও কোটি কোটি লোক প্রত্যহ যেমনভাবে মরছে। এমন মৃত্যুর কেই বা খবর রাখার উৎসাহ বোধ করে! আর কি উৎসাহই বা বোধ করবে? কেউ কি তাকে চেনে? মানব-সভ্যতায় তার দান কি?

নিবারণ ক্যানভাসার। হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল লাইনে সে

ট্রেণে ফেরী ক'রে বেড়ায়—জি, সি, দত্তের বিখ্যাত নিমের মাজনের, জয়পুরের মানসিং গুলির, নারকেল তেলের মসলার, সুগন্ধী ধূপকাঠির, আর মাথাধরা, মাথা ঘোরা, মাথা ঝন্‌ঝন্ কন্‌কন্ করার অব্যর্থ ও একমাত্র ওষুধ মাথলিনের।

তার বয়স পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, কি বড় জোর আটাশ অর্থাৎ তাকে দেখে তার বয়স বলা শক্ত। নিবারণ সাধারণ বাঙালীর চেয়ে অন্তত চার ইঞ্চি বেঁটে, রোগা। সে তুলনায় গোঁফজোড়া যথেষ্ট বড়। আর জুল্‌ফি নামাতে নামাতে গালপাট্টায় এসে দাঁড়িয়েছে। গাল মাংসহীন। চোয়াল চওড়া, আর সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে। নাকের গোড়াটা চ্যাপ্‌টা, কিন্তু ডগাটা বর্ত্তুলাকার। হাঁ-মুখ অসম্ভব রকম বড়, আর পুরু পুরু ঠোঁট। আর কণ্ঠ? নিবারণ পাশের গাড়ীতে কথা বললেও এ গাড়ী থেকে শোনা যায়।

লোকটি ওরই মধ্যে একটু সৌখীন। গায়ে থাকে একটি সিল্ক, নয়তো লংক্লথের পাঞ্জাবী। পরণের কাপড় ধোপ-দুরস্ত। হাতে রিষ্ট-ওয়াচ। মাথার চুলে পরিপাটি টেরী। এর সঙ্গে মিলত না তার জুতো। সময়াভাবে জুতোয় কালিও দিতে পারত না, মেরামতও করাতে পারত না। আর সময়ের অভাব ঘটত ক্ষৌরকর্ম্মে। ক্যানভাসারের রবিবারও নেই, দোল দুর্গোৎসবও নেই। সেই কারণে মুখমণ্ডল প্রায়ই শ্মশ্রুকণ্টকিত হয়ে থাকত।

ন'টার সময় যা-হোক-দু'টি নাকে-মুখে দিয়ে তাকে বেরুতে হয়। এই যা-হোক-দু'টির ব্যবস্থা করতেই তরুবালাকে উঠতে হ'ত

ভোর পাঁচটায়। নিবারণ একটু নিদ্রাবিলাসী। উঠতে তার সাড়ে সাতটা বেজে যেত। তাও কি সহজে? তরুবালা চা নিয়ে এসে কত সাধ্যসাধনা ক'রে তবে ওঠাত। চোখ বুঁজে বুঁজেই নিবারণ চাটুকু খেয়ে নিত। তারপরে একটু অবসাদ কাটলে উঠে তেল মেখে একেবারে দাঁতন করতে করতে নাইতে যেত—কি শীত, কি গ্রীষ্ম। স্নান ক'রে এসেই খেতে বসা, তারপরে ন'টা সাতের ট্রেণ ধরতে ষ্টেশনে দৌড়ান। যাওয়ার সময় তরুবালা হাসিমুখে দুটি পান দিত—প্রত্যহ, এর আর ব্যতিক্রম ছিল না। খোকা নিজের হাতে বাপের মুখে পান দুটি তুলে দিত। কোনো দিন প্রসাদ পেত, কোনো দিন পেত না।

তারপরে?

—জি, সি, দত্তের বিখ্যাত নিমের মাজন চাই? মাজন? আপনারা অনেক দামী দিশী ও বিলাতী মাজন ব্যবহার করে দেখেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের নিমের মাজনও একবার ব্যবহার ক'রে দেখতে অনুরোধ করি। মহাশয়গণ, এ মাজনে কোনো অদ্ভুত জিনিষ নেই। এ আমাদের দিশী গাছ-গাছড়ায় তৈরী। এতে আছে আমলা, হরিতকী, বহেড়া···দাঁত নড়া, দাঁতে রক্তপড়া, দাঁতের গোড়া কন্‌কন্ করা, দাঁতের পোকা প্রভৃতি যাবতীয় দন্তরোগ একদিনেই আরোগ্য হবে। এ আমার বাজে কথা নয় মহাশয়গণ। যাঁদের দাঁত হল্‌হল্ ক'রে নড়ছে, কিম্বা মুখে এমন দুর্গন্ধ হয় যে কারও সামনে কথা বলতে সঙ্কোচ হয়, এমন যদি এখানে কেউ থাকেন, তাঁকে একবার আমাদের এই মাজন পরীক্ষা ক'রে দেখতে অনুরোধ করি। এক মাসের ব্যবহারযোগ্য এক

কৌটার দাম মাত্র দু'পয়সা। এক সঙ্গে তিন কৌটা নিলে মাত্র পাঁচ পয়সায় পাবেন। মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে চমৎকার সুগন্ধ হবে। যাঁর দরকার হবে চেয়ে নেবেন।······

মুখের দুর্গন্ধ এত লোকের মধ্যে স্বীকার করতে কেউ রাজি নয়। যাদের দাঁত হল্‌হল্‌ ক'রে নড়ে তারাও এই ট্রেণে, মুখ ধোবার জল নেই কিছু নেই, এমন মহৌষধ ব্যবহার ক'রে দেখতে সম্মত হয় না। তবু প্রয়োজন মতো কেউ কেনে, কেউ কেনে না।

নিবারণ বিখ্যাত মাজন ব্যাগে পুরে আবার একটা নতুন জিনিষ তুলে চীৎকার আরম্ভ করে ;—

—জয়পুরের মানসিং গুলি। চাই কারও ? মহাশয়গণ, আমাদের নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি, একটু দয়া ক'রে শুনবেন।

হয়তো কোনো ভদ্রলোক একটু ঝিমুচ্ছিলেন। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বলেন, দয়া না ক'রেও শুনতে পাচ্ছি মশাই, একটু আস্তে বলবেন।

নিবারণ অপ্রস্তুত হয় না, হাসে। গলা একটুও না নামিয়ে ব'লে চলে—মুখস্থ বলার মতো :

—মহারাজা মানসিংহ এই গুলি ব্যবহার করতেন। হাসবেন না মহাশয়গণ, আপনাদের দেশে সব ছিল। কালের প্রভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। যাতে বিলিতি ওষুধের দোকানের ছাপমারা নেই, এখন আপনারা তার নাম শুনলেও হেসে উঠবেন। আমার মুখের কথায় আপনাদের বিশ্বাস হবে না মহাশয়গণ। কিন্তু পরীক্ষা›

ক'রে দেখতে দোষ কি? এতে স্মৃতিশক্তি বাড়ে, দেহের বল বাড়ে, কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হয়, গলা ধরা, ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া, টন্সিলের ব্যথা সমস্ত আরোগ্য হয়। মূল্য একশো গুলির শিশি মাত্র চার আনা। আমার কাছে নমুনার ছোট শিশিও আছে। মূল্য চার পয়সা মাত্র। যাঁর আবশ্যক হবে চেয়ে নেবেন।

তারপরে নারকেল তেলের মসলা। তারপরে মাথলিন।

সবই পরের পর নিবারণ তোতাপাখীর মতো গড় গড় ক'রে বলে। যাদের ওষুধ, কি বলতে হবে তারা তা লিখে দিয়েছে। নিবারণ মুখস্থ ব'লে যায়। তার নিজের 'অবদান' মাঝে মাঝে 'মহাশয়গণ' কথা বসিয়ে দেওয়ায়।

ওর সাহিত্যিক কৃতিত্ব হচ্ছে সুগন্ধী ধূপের বেলায়। সেইজন্যে এইটে সে সব শেষে বলে :

—ধূপ চাই? মহীশূরের ধূপ? বাসর-মজান, রতিবিলাস ধূপ আছে।

সকলের দিকে চেয়ে আবার বলে :

—রতিবিলাসও বটে, আরতিবিলাসও বটে। যার যেমন প্রয়োজন হবে চেয়ে নেবেন।

'বাসর-মজান', 'রতিবিলাস'—আর তার সঙ্গে 'আরতিবিলাস' এই তিনটে কথা তার নিজের আবিষ্কার এবং এই 'সাহিত্যিক প্রচেষ্টায়' সে বেশ গর্ব্ব অনুভব করে। আরও কয়েকজন ধূপ বিক্রি করে, কিন্তু তারা শুধু বলে মহীশূরের সুগন্ধী ধূপ। নিবারণের 'ট্রেড-মার্ক' যেন কেউ ব্যবহার না করে সেজন্যে তাদের সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছে।

নিবারণ তার 'ট্রেড-মার্কের' ফল শ্রোতৃবৃন্দের ওপর কি রকম হ'ল—চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর বলে :

—যাঁরা অনেকদিন পরে বাড়ী যাচ্ছেন তাঁরা অন্তত এক প্যাকেট কিনে নিয়ে যান। দেখবেন সুগন্ধে ঘর মৌ মৌ করবে, 'মানুষের' মুখে হাসি ফুটবে, সুখে নিশি প্রভাত হবে, আর আমার ধূপের জয়জয়কার হবে। বাসর-মজান ধূপ। সুগন্ধে বাসররাত্রির কথা মনে পড়বে। নিয়ে যান। রতিবিলাস ধূপ, আরতি-বিলাসও বটে—যাঁর যেমন দরকার। এক প্যাকেট মাত্র দু'পয়সা, পাঁচ পয়সায় তিন প্যাকেট। এক রাত্রেই দামের চতুর্গুণ উশুল হবে।

নিবারণ আত্মতৃপ্তির হাসি হাসে। তার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ফলেই হোক, আর যে কারণেই হোক ধূপটা বিক্রি হয় বেশ, মানে অন্য জিনিষের চেয়ে বেশী।

প্রায়ই কামরায় দু' একজন পরিচিত লোক থাকেন। ছ'বছর ধ'রে এই লাইনে সে ঘুরছে। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে রসিকতা হয় :

—এই যে বাবুদাদা, এবার অনেকদিন পরে যে! ক'লকাতায় বাসা করেছেন? বেশ, বেশ। তা হোক, বাসর-মজান ধূপ দু' প্যাকেট নিয়ে যান। এত সস্তায় এ জিনিস আর কোথাও পেতে হয় না!

বাবুদাদার 'না' বলবার উপায় থাকে না। ততক্ষণে নিবারণ তাঁকে দু' প্যাকেট ধূপ গছিয়ে দিয়েছে।

বাবুদাদা কেবল একবার বলেন, দু' প্যাকেট নয়, এক প্যাকেট দিন।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! নিবারণ হাসতে হাসতে বলে, এক প্যাকেটে কি হয়? ক'লকাতায় বাসা করেছেন, আবার কবে দেখা হবে···কি রকম! বড়বাবু নাকি? এই নিন আপনার সুবাসিত নারকেল তেলের মসলা। আজ শনিবার। জানি কি না, আপনি আজ আসবেনই। আমি এই ছ'বছরের মধ্যে আপনাকে একটা শনিবারও বাদ দিতে দেখলাম না।

নিবারণ নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

—ক'প্যাকেট দোব? দু'টো? চারটে?

বড়বাবু তাড়াতাড়ি বললেন, না, না। আজ আর দরকার হবে না। সেদিন দুটো নিয়ে গেছি, তাই এখনও ফুরোয়নি।

নিবারণ বড়বাবুর হাতে দুটো প্যাকেট গুঁজে দিয়ে বলে, এ সে প্যাকেট নয় বড়বাবু, আপনার জন্যে স্পেশাল তৈরী ক'রে রেখেছিলাম। বাড়ী নিয়ে যান, যিনি সমঝ্‌দার তিনি বুঝবেন।

নিবারণ হো হো ক'রে হাসলে।

প্রতি কামরাতেই এমনি দু'একজন আছেই। কেউ দাদা, কেউ ভাই, কেউ বাবু। কিন্তু কারও নাম সে জানে না। তারও নাম কেউ জানে না। শুধু চেনার পরিচয়। নাম পাতিয়ে নিয়েছে নতুন ক'রে। তাতে উভয় পক্ষেরই কাজ চলে যায় নির্ব্বিঘ্নে। প্রতিদিনের লেন-দেনে কোনো অসুবিধা হয় না। সেই কারণে এর চেয়ে ভালো ক'রে চেনবার জন্যে কোনো পক্ষেরই কৌতূহল এর চেয়ে বেশী এগোয় নি।

নিবারণের পৃথিবী বলতে এই। ঘরে মা, স্ত্রী, একটা শিশুপুত্র —আর বাইরে এরা। তার নামের কারবার নেই। মা, মা। মায়ের নাম থাকে না। স্ত্রী, ওগো। আর শিশুপুত্রের নাম এখনও স্থির হয় নি। যে যা খুশী তাই বলে ডাকে। তাতেই শিশু সাড়া দেয়। আর বাইরে একদল নামহীন, অপরিচিত বন্ধু। এই নামের পৃথিবীতে তার কারবার একটু অদ্ভুত ধরণের। যত নামহীন লোক নিয়ে।

তার অসুখের খবর কেউ পেলে, কেউ পেলে না। কেউ জানলে, কেউ জানলেই না। কিন্তু সবাই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মনে মনে একবার বোধ হয় অনুভব করলে।

তরুবালা ঘাটে গলা ডুবিয়ে রয়েছে তো রয়েইছে।

ওর যেন জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে। কিছুরই আর খেয়াল নেই। ছোট মেয়ের মতো আপন মনে জল নিয়ে খেলাই করছে, খেলাই করছে। সময়ের হিসাব নেই।

ঘোষালগিন্নি ঘাটে এসে সশব্দে বাসন নামালেন। তরুবালার কানে এ শব্দ পৌঁছুলই না। তাকে অমন নিশ্চিন্তভাবে জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে দেখে ঘোষালগিন্নি ভাবলেন, নিবারণ বোধ হয় ভালোই আছে।

জিজ্ঞাসা করলেন, নিবারণ কেমন আছে বৌমা?

নিবারণ? নিবারণ কে? তরুবালা অকস্মাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর

শুনে চমকে উঠল। কিছুই যেন সে বুঝতে পারে নি এমনি ক'রে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

তার পরে বিস্মৃতির তিমির বিদীর্ণ ক'রে ধীরে ধীরে জেগে উঠল বাস্তব পৃথিবীর রূপ—যেখানে মায়ের চোখের সুমুখে মরে ছেলে, স্ত্রীর চোখের সুমুখে মরে স্বামী, ভায়ের চোখের সুমুখে মরে ভাই।

নিষ্ঠুর, কদর্য্য পৃথিবী।

তরুবালার চোখের পল্লবে আবার ঘনিয়ে এল বিষণ্ণ ছায়া, ঠোঁটে জাগল নিরতিশয় অসহায়তা, আর দুই চোখে ভ'রে উঠল অসীম শূন্যতা।

তরুবালা মাথায় ভালো ক'রে ঘোমটা দিয়ে ক্লান্তকণ্ঠে বললে, ভালো নেই খুড়ীমা।

সামনের মরা আমড়া গাছের শুকনো ডালে একটা কাক এমন ক'রে ডেকে উঠল যে, দু'জনেই ভয়ে ভাবনায় শিউরে উঠল।

সেদিন আর নয়, কিন্তু তার পরের দিন দুপুরের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। সকালেই নাভিশ্বাস উঠেছিল। ঘোষালগিন্নি চটপটে মেয়ে। ব্যাপার বুঝে সকালেই নিবারণের ছেলেকে দুটো ভাতে-ভাত নিজের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জেদাজেদিতে তরুবালাকেও অমন অবস্থায় স্বামীকে ফেলে রেখে একবার থালার সামনে বসতে হয়েছিল, এক টুকরো মাছও মুখে

দিতে হয়েছিল। এ নাকি প্রথা। প্রতিবেশীরা তাকে জোর ক'রে স্বামীর কাছ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘোষাল বাড়ীর রান্নাঘরে বসিয়ে দিয়েছিল। কে একজন একটুকরো মাছও তার মুখে গুঁজে দেয়। এ নাকি লক্ষণ!

তখনই তরুবালা স্বামীর শিয়রে ফিরে আসে। কিন্তু নিবারণের কথা সকাল থেকেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন শুধু চোখের দেখা। চোখ মেলে স্বামীর শেষ যন্ত্রণা দেখা।

সেও অল্পক্ষণের জন্যে। দুপুরের মধ্যেই নিবারণ গেল। সন্ধ্যার মধ্যেই তার পার্থিব দেহের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট রইল না।

নিবারণের সঙ্গে আমার পরিচয়ও আর পাঁচজনের মতোই অতি সামান্য। ট্রেণের জনৈক সহযাত্রীর মুখে এই ঘটনা শুনেছিলাম। ঘটনাও আজকের নয়, অনেকদিন আগের। কিন্তু আমাদের ট্রেণ সেই পানাপুকুরের ধার দিয়ে চলবার সময় হঠাৎ মনে পড়ল নিবারণকে, অনেক দিন পরে।

এই গতির জগতে মানুষের বিশ্রামের অবসর নেই। নিবারণের মৃত্যুর পর এই পথ দিয়ে হাজার ট্রেণ এসেছে, গেছে। হাজার হাজার যাত্রী। এইখানে পানাপুকুরের সামনে এসে কচিৎ কারও হয়তো তাকে মনে পড়েছে, একটি মুহূর্তের জন্যে। তেমনি ক'রে আমারও তাকে মনে পড়ল অনেক কাল পরে। ওই পানা-পুকুরের অনেক পরিবর্তনই নিশ্চয় তার পরে হয়েছে। কিন্তু দেখে-

দেখে তা আর চোখে পড়ে না। ওরই মধ্যে নিবারণের স্মৃতি একটুখানি কোথাও যেন বেঁচে আছে। ওদিকে চাইতেই এক মুহূর্তের জন্যে তাকে একবার মনে পড়ল।

একবার মাত্র। তাও নিবারণের জন্যে নয়, বিশেষ কোনো একজন লোকের জন্যেও নয়। একবার শুধু মনে হ'ল, যাদের চিনতাম তাদের মধ্যে কত মানুষই নেই। চকিতে সমস্ত মন কেমন উদাস হ'য়ে গেল।

ট্রেণ চলেছে ঝড়ের বেগে।

শ্রীরামপুর···শ্রীরামপুর···

নতুন ষ্টেশন। সে পানাপুকুরের চিহ্নমাত্র নেই। আবার নতুন জগৎ, নতুন আবেষ্টনী। পাঁচ মিনিট আগের মন পাঁচ মিনিট পিছিয়ে পড়ল। তারও হ'ল মৃত্যু। আর তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শেষ অঙ্ক

এ বৎসর শীতের যেন পৃথিবীর উপর মমতা পড়িয়া গিয়াছিল—ছাড়িয়া যাইতে আর মন সরিতেছিল না। ফাল্গুনের মাঝামাঝি, কিন্তু মাঘ মাসের মতো দুরন্ত শীত।

সূর্য্যোদয়ের তখনও অনেক বিলম্ব আছে। তাহার উপর এমন কুয়াশা করিয়াছে যে, দশ হাত দূরের লোককে চেনা যায় না। এত ভোরেই ভদ্রলোক তাঁহার দক্ষিণদ্বারী বৈঠকখানার বারান্দায় একটা খুঁটিতে পাটের গোছা বাঁধিয়া মোড়ায় বসিয়া দড়ি কাটিতেছেন। পাশেই দেওয়ালে হুঁকাটা ঠেসান রহিয়াছে। কিন্তু দড়ি কাটার তাড়া এত বেশী যে, সেটা টানিবার পর্য্যন্ত ফুরসৎ নাই।

আপনারা বাহিরের লোক, ইঁহাকে চিনিবেন না। কৃষ্ণকমল মিত্রের নামও আপনারা শোনেন নাই। এবং যদি বলি যে, ইনিই আপনাদের সুপরিচিত এবং স্বনামখ্যাত নন্দকুমার মিত্রের পিতা, তাহা হইলে হয় তো কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিবেন। মনে করিবেন, আমি বোধ হয় আপনাদের সঙ্গে রসিকতা করিতেছি।

আপনাদের দোষ নাই। কারণ কলিকাতা হাইকোর্টের উদীয়মান উকীল মিঃ এন, কে, মিত্রের পিতার সম্বন্ধে মানুষ যেরূপ আশা করে তাহার কিছুই ইঁহার মধ্যে পাইবেন না। অন্ততঃ তাঁহার পিতা যে এত ভোরে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া মোড়ায় বসিয়া পাটের দড়ি কাটেন, ইহা নন্দকুমারের মতো ফিটফাট বাবু মানুষকে যে দেখিয়াছে সে কি করিয়া বিশ্বাস করিবে?

নন্দকুমার লম্বা, ছিপছিপে, গৌরবর্ণ। মাথার ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি সর্ব্বদা সুবিন্যস্ত। পোষাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

বাহিরের কোনো লোক তাঁহাকে কখনও খোলা গায়ে দেখে নাই। নন্দকুমার থেলো হুঁকায়, এমন কি গড়গড়াতেও তামাক খান না— দামী চুরুট ব্যবহার করেন। এক কথায়, সহুরে ভদ্রলোক বলিতে যা বোঝায় তাই। পক্ষান্তরে কৃষ্ণকমলবাবু সহর কখনও চক্ষে দেখেন নাই। নিজের গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইবার কথা উঠিলেই দুশ্চিন্তায় তাঁহার মাথা ধরিয়া ওঠে। পাড়ার মধ্যে এবং বাড়ীতে তিনি খোলা গায়ে এবং খালি পায়েই বেড়ান। ভিন্ন পাড়ায় যাইতে হইলে কখনও একটি বেনিয়ান, কখনও বা শুধুমাত্র একখানি চাদর কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়েন। ক্যাম্বিসের এক জোড়া জুতাও তখন পায়ে ওঠে। আর চুলের কথা যদি বলেন, তো সে বালাই তাঁহার নাই। সম্মুখের দিক্‌টায় প্রকাণ্ড বড় একটা টাক চক্ চক্ করিতেছে। তাহার উপর গলায় তিন কণ্ঠি তুলসীর মালা থাকায় রূপই বদলাইয়া গিয়াছে।

সে যাহাই হউক, দক্ষিণদ্বারী বৈঠকখানায় অত ভোরে বসিয়া যিনি পাটের দড়ি কাটিতেছিলেন তিনি মিঃ এন, কে, মিত্রের পিতা কৃষ্ণকমলবাবু, এইটুকু বলিলে আপনাদের অর্থাৎ বাহিরের লোকের বুঝিতে আর কষ্ট হইবে না। অবশ্য নন্দকুমার যদি শুধুই হাই-কোর্টের একজন উদীয়মান উকিল হইতেন, তাহা হইলে কেই বা তাঁহাকে চিনিত! কিন্তু তিনি যে আবার সামাজিক ও রাজ-নৈতিক ছোট বড় অন্ততঃ বিশটি প্রতিষ্ঠানের কাহারও সম্পাদক, কাহারও বা সহকারী সম্পাদক। খবরের কাগজে কোনো না কোনো উপলক্ষে দৈনিক একবার করিয়া তাঁহার নাম ওঠেই।

আপনারা খবরের কাগজের নিয়মিত পাঠক। সুতরাং তাঁহার নাম নিশ্চয়ই জানেন।

কিন্তু আমাদের এদিকে খবরের কাগজের অভ্যাগম কদাচিৎ ঘটে। নন্দকুমারও গ্রামে কচিৎ আসেন। সে জন্য তাঁহাকে বড় কেহ একটা চেনে না। এদিকে মিত্র মহাশয় বলিলে কৃষ্ণকমল-বাবুকেই বোঝায়। এবং নন্দকুমারের নামও কেহ জানে না। বলে, মিত্র মহাশয়ের ছেলে। কিন্তু আমার এই লেখা তো এদিকের কাহারও চোখে পড়িবে না? শুধু আপনাদের জন্যই মিত্র মহাশয়ের এত পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হইল। নহিলে এদিকে তিনি স্বনামধন্য পুরুষ।

মিত্র মহাশয় ভোরে উঠিয়া পাট কাটিতেছিলেন।

যদু শাঁখারী গাড়ুটা নামাইয়া প্রাতঃপ্রণাম জানাইল। মিত্র মহাশয় অপাঙ্গে একবার তাহাকে দেখিয়া পুনরায় দড়ি কাটায় মনোনিবেশ করিলেন। মুখে বলিলেন, তামাক খা।

ঘরের ভিতরে একটা কাঠের হরপিতে তামাক, টিকা, দেশলাই প্রভৃতি তামাক সাজার সরঞ্জাম থাকিত। যদু তামাক সাজিয়া, টিকা ধরাইয়া, কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, এত সকালেই দড়ি কাটতে বসেছেন যে!

যদু, মিত্র মহাশয়ের ছেলেবেলার খেলার সাথী। এক সঙ্গে গাছে উঠিয়াছে, সাঁতার কাটিয়াছে, পাখীর ছানা পাড়িয়াছে,

এক হুঁকায় তামাক খাইয়াছে, মারামারি—খেলাধুলা করিয়াছে এবং আরও কত কি করিয়াছে। তারপরে কৃষ্ণকমল বড় হইয়া জমিদারী, বিষয়সম্পত্তি দেখিতে লাগিলেন এবং বুড়া হইয়া মিত্র মহাশয়ে পরিণত হইলেন; কিন্তু যদু শাঁখারী যদু শাঁখারীই রহিয়া গেল। সমস্ত দিন পাড়ায়-পাড়ায় গ্রামে-গ্রামে শাঁখা বিক্রী করিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যা হইলেই ছেলেদের ছোট কাপড় একখানা পরিয়া হুঁকাটি হাতে করিয়া মৃদুমন্দ কাশিতে কাশিতে মিত্র মহাশয়ের বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। শুধু সে নয়, আরও অনেকেই থাকে।

তারপর:

—হা হে মহান্ত, তোমার কাচিখানায় গোগাল প'ড়ে জল যে সব বেরিয়ে গেল। মাঠে বেরোও, না বেরোও না?

—যাক্ গে মশায়, আর পারি না। ছোঁড়া দুটো খাচ্ছে দাচ্ছে আর মোষের মতন চেহারা কর্‌ছে। আমি দু'দিন জ্বরে প'ড়ে। হাঁয়ে হাঁয়ে বলছি, যা রে, একবার মাঠ দিয়ে যা। জমিগুলোর কি হচ্ছে না হচ্ছে, একবার দেখে আয়। তা শালার ছেলেরা দিনরাত কেবল জল দিয়ে টেরিই বাগাচ্ছে—টেরিই বাগাচ্ছে। যাবে কখন! যা হবার তা হোক, মশায়, আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম।

বলিয়া নিদারুণ ক্ষোভে মহান্ত নদাই মণ্ডলের হাত হইতে কলিকাটা এক প্রকার কাড়িয়া লইয়াই শোঁ-শোঁ করিয়া টানিতে লাগে।

কিংবা—

—যে যা বলে বলুক বাপু, কিন্তু মিত্রি মশায়ের টিপেল-গ'ড়ের বাকুড়ির কাছে হার এবার সব্বারই। দক্ষিণ মাঠে অমন ফলন্ এবার আর কোন জমিতে হতে হয় না। যেমন ধান, তেমনি খড়।

—তা বিঘে পেছু তেরো-চোদ্দ পণ বিড়ে তো হবেই।

মিত্র মশায়ের ঠোঁটের ফাঁকে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া ওঠে। তিনি হাসিয়া বলেন—আরে, সার কি রকম দিয়েছি তার হিসেবটা একবার কর্। শুধু বাকুড়ি কেন, ঐ পুকুরের নামোতে যে বেঁকী-খানা আছে তার আখটা দেখেছিস্?

সকলেই গালে হাত দিয়া বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আখ বটে!

—এখুনি আমার মাথাভোর হয়েছে। আর দু'দিন পরেই ওর মেড়া বাঁধতে হবে। নইলে লতিয়ে যাবে।

—লক্ষ্মী-আশ্চয় পুরুষ। যা লাগান তাই সোণা ফলে।

আবার কোন দিন বা রামায়ণ, মহাভারত পড়া হয়। মিত্র মহাশয় নাকের ডগায় চশমা লাগাইয়া সুর করিয়া পড়েন, শ্রোতাদের চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়। গাছের পাতা পর্য্যন্ত নড়ে না। মনে হয়, তাহারা পর্য্যন্ত যেন স্থির হইয়া শুনিতেছে। কে বা তামাক সাজে, কে বা আগুন তোলে! মিনিটে-মিনিটে যাহাদের তামাক চাই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহারা সমস্ত ভুলিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরিত-কথা শ্রবণ করে। বেঁকী জমি না, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন না, ধান-চাল-আখ না, কোন কথাই তখন আর ইহাদের খেয়াল থাকে না। মিত্র মহাশয় এবং তাঁহার মত আর দুই একজন ছাড়া ইহাদের কাহারও অক্ষর-পরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই। রামায়ণ-মহাভারতের সকল কথার অর্থও বোধ হয় ইহারা জানে না।

অথচ ওই বেঁকী জমি এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, যাহাদের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সেও খাটিয়া খাটিয়া দেহপাত করিতেছে, তাহাদের ছাড়িয়া মন যে কোন্ কল্পলোকে চলিয়া যায় তাহা হয়তো তাহারা নিজেরাই বলিতে পারিবে না।

ইহারা সত্যবাদী নয়, জিতেন্দ্রিয় নয়, অতিশয় যে ধর্ম্মপরায়ণ এমনও বলিতে পারি না। গভীর রাত্রের অন্ধকারে পরের আড়া হইতে অবলীলাক্রমে ইহারা মাছ চুরি করিয়া আনে। লুকাইয়া পরের জমির জল কাটিয়া নিজের জমি ভর্ত্তি করা তো নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। সের কয়েক আলু কিম্বা এক জোড়া চটি জুতা লইয়া আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যও দেয়। আবার মিত্র মহাশয়ের বৈঠকখানায় রামায়ণ অথবা মহাভারত শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া বুকও ভাসায়। কোথাও কথকতা হইতেছে শুনিলে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হয় এবং ভাল মন্দ বিবিধ প্রকারে সংগৃহীত আজীবনের সঞ্চয় তীর্থভ্রমণে ব্যয় করিতেও দ্বিধা করে না। এমনই ইহারা।

যদু শাঁখারী কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল—এত ভোরেই দড়ি কাটতে ব'সেছেন যে!

মিত্র মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—তবে আর কাল বল্লাম কি? বারটার গাড়ীতে আমার দাদুভাইরা এসেছেন যে। উঠ্‌লো বলে। তখন কি আর আমাকে নিশ্বাস ফেল্‌তে দেবে নাকি? তাই,

ভাব্‌লাম, ভদ্রা গাইটার দড়িগাছা কে চুরি ক'রে নিয়েছে, ওরা উঠ্‌তে উঠ্‌তে দড়ি একগাছা পাকিয়ে ফেলি। হবে না ?

যদু কলিকাটা মিত্র মহাশয়ের হুঁকায় বসাইয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—খুব হবে। কত ক্ষণকারই বা কাজ !

একটু থামিয়া যদু হাসিয়া বলিল—বাবা, বাঁচ্‌লাম।

—কি হ'ল ?

—আজ্ঞে ভাব্‌তাম, শুধু বুঝি আমাদেরই গরুর দড়ি চুরি যায়। দেখ্‌ছি, আপনারও···

বাধা দিয়া মিত্র মহাশয় বলিলেন—আর বলিস্‌ নে, যদু। দড়ি চুরি ক'রে ক'রে ভুষ্টি-নাশ ক'রে দিলে। গোয়ালে দড়ি ফেলে রাখার উপায় নেই। কিন্তু যে দিন চোখে পড়বে···

—আর চোখে পড়েছে ! শালা-শালীরা এমন হাত-সাফাই যে এত তক্কে-তক্কে থেকেও ধর্‌তে পার্‌লাম না। শুধু কি দড়ি মশায় ? খড়ের পালা থেকে নিত্যি দু' আঁটি চার আঁটি খড় চুরি হয়ই। কি করি বলুন তো ?

বলিতে পারিলে তো মিত্র মহাশয় নিজেই সে পন্থা অবলম্বন করিতেন। খড় কি আর তাঁহারই চুরি যায় না ? তথাপি তিনি কি যেন একটা বলিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু সে কথা আর বলা হইল না। গাড়ু হাতে করিয়া নন্দকুমার বাহিরে আসিলেন। তখন সকাল হইয়া গিয়াছে।

নন্দকুমারের আবির্ভাবে মিত্র মহাশয় যেন বিব্রত হইয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি যদুকে ডাকিয়া বলিলেন—নে রে বাপু, তুই কাট্‌ছিলি, কাট। আমার আজকাল আর হাত সরে না।

বলিয়া কুকার্য্যপরায়ণ ছোট ছেলে যেমন আবদারের ভঙ্গীতে হাসে তেমনি করিয়া হাসিলেন।

যদু ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। নন্দকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিল—কি বাবা, ভাল তো সব?

নন্দকুমার উদ্ধত নয়, অবিনয়ীও নয়। কিন্তু সে ছেলেবেলা হইতেই স্বল্পভাষী। চলিয়া যাইতে যাইতে শুধু একবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ, ভাল।

নন্দকুমার চলিয়া গেলে মিত্র মহাশয় পাটের গোছা খুলিতে খুলিতে বলিলেন—ব্যাটার বাপ হওয়া যে কত ঝঞ্ঝাট সে তুই বুঝবি নে, যদু। কাল থেকে যে কী ভয়ে-ভয়ে আছি সে আমিই জানি। দড়ি কাট্‌তে পাব না, গোয়াল পরিষ্কার কর্‌তে পাব না, পাঁচীল কোথাও ভেঙ্গে গেলে নিজে যে দু'পাট মাটি চাপিয়ে দোব তার উপায় নেই। তুই না হয় বাবাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাখ্‌তে চাস্, কিন্তু বাবার দিন কাটে কেমন ক'রে বল্ তো?

পুত্রের উদ্দেশে এই কয়টি কথা বলিয়া মিত্র মহাশয় যদুর মুখ পানে চাহিয়া হাসিলেন। সে হাসি বিষাদের কি তৃপ্তির, তাহা বোঝা গেল না।

পাটের গোছা ঘরের ভিতর ভাল করিয়া সামলাইয়া রাখিয়া আসিয়া মিত্র মহাশয় তাঁহার দড়ির মোড়াটির উপর ভাল করিয়া বসিলেন। এবং যদুকে সম্বোধন করিয়া পুত্রের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন—

—চিরটা কাল তুই বাইরে-বাইরে কাটালি, পাড়াগাঁয়ের হাল তো জানিস্ নে। পাটের দড়ি যদি কাউকে কাট্‌তে দোব,

বেমালুম তার থেকে দু'গুছি সরিয়ে ফেলবে। জমির ধান ভাগীদার জমি থেকেই সরিয়ে ফেলে। নিজে না দেখ্‌লে চলে? মাইনে দিয়ে রাখাল রেখে তার হাতে গরু দিয়ে বিশ্বাস নেই। নিজের হাতে যেদিন খেতে দোব না, সেইদিনই দেখ্‌ব তাদের পেট প'ড়ে আছে। আমার কি ব'সে থাক্‌লে চলে? ওরে, নিমগাছটা থেকে দাঁতনের জন্যে একটা ডাল পেড়ে দে' তো।

লোকটা গাছে উঠিল। কিন্তু যদু, মিত্র মহাশয়ের দন্তহীন মুখের দিকে চাহিল।

মিত্র মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—আমার জন্যে নয় রে, নন্দ'র জন্যে। ছেলেটা নিমের দাঁতন কর্‌তে বড় ভালবাসে। সেখানে পয়সা দিয়েও এমনটি তো পায় না!

যদু উঠিতেছিল। কিন্তু মিত্র মহাশয় তাহাকে বসাইয়া বলিলেন —আরে বোস্ বোস্। একবার তামাক খা দেখি।

যদু তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল—একবার বাগ্দীপাড়ায় যেতে হবে মুনিষ দেখতে।

মিত্র তাড়াতাড়ি বলিলেন—ভালই হ'ল। বাপু, জনকয়েক জেলে ডেকে দিবি তো। দিদিমণিদের দিই ক'দিন মাছ খাইয়ে। বরফ-দেওয়া মাছই তো খায়। একবার টাট্‌কা মাছের স্বাদটা দেখুক। কি বলিস্?

বলিয়া মিত্র মহাশয় হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

—আর একটি আজব চীজ আমার দিদিমণিকে আর দাদু ভাইকে খাওয়াব। দেখি, বুড়ী কেমন চিন্‌তে পারে!

বলিয়া মিত্র মহাশয় লঘু-কৌতুকভরে হাসিলেন।

—বাঁশের কোঁড়ার তরকারী। খেয়েছিস্ কখনও? খাস্‌নি? আচ্ছা, তোরও আজকে নেমন্তন্ন রইল। তোর বৌ-ঠাকুরুণের হাতের রান্না, খেলে আর ভুল্‌তে পার্‌বি নে।

যদু সকাল বেলাতেই একটি ভাল সওদা করিয়া পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাসিল।

মিত্র মহাশয় বলিতে লাগিলেন—সেখানে না পায় খাঁটি দুধ, না পায় কিছু। শুধু রং-বেরঙের পোষাক প'রে আর হরলিক-না-কি খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে ওঠে। ছেলে মেয়ে দুটোর চেহারা দেখ্‌লে তোর চোখে জল আস্‌বে। আমার ঘরে দুধ দই খাবার লোক নেই, আর সেখানে বাছারা দুধের অভাবে শুকোচ্ছে।

শিশু দুইটি সত্যই বড় রুগ্ন। দিদিমণির বয়স বছর ছয়েক। ক্রমেই লম্বা হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু শরীরে মাংস কোথাও নাই। ধারালো ইস্পাতের মত চক্-চকে রং। হলুদের আভামাত্র নাই। বড় বড় ড্যাব্‌ডেবে চোখ। তাহাতেও রক্তের কণামাত্র নাই। মাথায় ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল।

দিদিমণি কাছে আসিয়া ডাকিল,—দাদু ভাই!

অনেক দিন পরে দেখা। বেচারা লজ্জায় চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছে না। দিদিমণির কথা বড় মিষ্ট। মিত্র মহাশয় শশব্যস্তে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার দুই উরুর উপর ছোট্ট দু'খানি পা তুলিয়া দিয়া দিদিমণি যেন আনন্দে এলাইয়া পড়িল। ঠিক সেই সময়ে নন্দকুমার গাড়ু হাতে ফিরিয়া আসিলেন এবং কন্যার এই প্রকার অশিষ্টতা লক্ষ্য করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—খুকু, পা নামিয়ে বোসো।

খুকু ভয়ে ভয়ে পা নামাইয়া বসিল।

—আমার দাদু-ভাইকে দেখ্‌ছি নে যে! সে কোথায়?

নন্দকুমার তখন ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু খুকুর তথাপি ভয় যায় নাই। চুপি চুপি অস্ফুটস্বরে বলিল—তার যে জ্বর দাদু ভাই।

তারপর বুড়ী মেয়ে ঠোঁটের এবং চোখের বহুবিধ ভঙ্গী করিয়া বলিতে লাগিল—খোকাটা ভারী রোগা, দাদু-ভাই। প্রায়ই ওর জ্বর হয়। বাবা বলেন, ও বাঁচ্‌বে না।

মিত্র মহাশয় তাড়াতাড়ি জিভ্ কাটিয়া, শিউরিয়া উঠিয়া বলিলেন—ছিঃ দিদিমণি, বল্‌তে নেই। ভাল হ'য়ে যাবে বৈ কি! এখানে থাক্‌লেই ভাল হ'য়ে যাবে।

একটা টিকটিকি টিক্ টিক্ করিয়া উঠিল। মিত্র মহাশয় দেওয়ালে তিনটা টোকা দিয়া আঙ্গুলটা কপালে ঠেকাইলেন।

খোকাভাইকে দেখিয়া মিত্র মহাশয়ের বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। সেই ছেলের এ কী রূপ! তিন বছরের ছেলে, বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। কেবল চাদরের অন্তরালে বুকটা কামারের জাঁতার মত থাকিয়া থাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। মিত্র মহাশয়কে দেখিয়াই খোকা যেন কী রকম করিয়া উঠিল। কয়েকবার ভেদ-বমি করিয়াই সে দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। উঠিবার শক্তি নাই। একটা কথাও কহিতে

পারিতেছে না। কেবল চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। মিত্র মহাশয়ের মনে হইল, সেই নিস্তব্ধ কক্ষে যেন একটি অতি সূক্ষ্ম, শীর্ণ অশরীরী বাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছে,—দাদু গো, বাঁচাও,—বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

মিত্র মহাশয় হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। নন্দকুমার বিরক্তভাবে তাঁহার পানে চাহিতে, তিনি মুখে কাপড় দিয়া চুপ করিলেন। কিন্তু অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় তাঁহার চোখ ফাটিয়া দর-দর-ধারে জল পড়িতে লাগিল।

ভেদ আর বমি। এক একবার বমি করিতে ছেলের মুখ নীল হইয়া উঠিতেছে। চোখ কপালে উঠিতেছে। আশঙ্কা হইতেছে, এখনই বুঝি তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে!

একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দিন দুই দেখিলেন। কোন ফল পাওয়া গেল না। এলোপ্যাথিক ঔষধ মুখে দেওয়া মাত্র বমি হইয়া যায়। চিকিৎসকের পর চিকিৎসক আসেন। কিন্তু ফল কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না। রোগীর আর কোন সাড়াশব্দ নাই। কেবল অত্যন্ত মৃদু ভাঙা গলায় মাঝে মাঝে কিসের জন্য চেঁচায়। তৃষ্ণা পাইলে পাখীর মত হাঁ করে।

মিত্র মহাশয় ঘরে বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আর মিত্র-গৃহিণী সেই যে রোগীর শিয়রে মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছেন, আর উঠেনও নাই, আহারও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছে, এইবারে বুঝি সুখের সংসারে আগুন লাগিল। ছেলে-পুলে, নাতি-নাতিনী রাখিয়া যাওয়া বুঝি আর

হয় না। তাঁহার হাত-পা অবশ হইয়া যেন পেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কেবলই বলিতেছেন, মুখ রাখো ঠাকুর, মুখ রাখো। এই যে মুখ ঢাকিলাম, যদি কোন দিন মুখ রাখ, তবেই এ মুখ লোকসমাজে খুলিব, নহিলে এই শেষ। ঠাকুর, ঠাকুর, যদি কখনও কোন অপরাধ করিয়াই থাকি, এমন করিয়া তাহার শাস্তি দিও না। এমন করিয়া অতি বড় অপরাধেরও শাস্তি দিতে নাই।

নন্দকুমার কি যেন ভীষণ পরিণামের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন। মুখে কথা নাই। স্নান করিতে ডাকিলে স্নান করিতে যান, আহারের ডাক পড়িলে আহারে বসেন। বাকী সময়টা কখনও রোগীর শিয়রে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকেন, কখনও আপন মনে উঠানে পায়চারী করিতে থাকেন।

কেবল বেচারী শোভা যেন ইহাদের গোষ্ঠীর বাহিরে। দুইটি সন্তানের জননী হইলে কি হয়, তাহার বয়স নিতান্তই অল্প, কুড়ির বেশী হইবে না, এবং বুদ্ধি আরও অল্প। এতগুলি লোক যে একটি ছেলের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যেন সে বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। জীবনে কখনও কোন মানুষকে চোখের সম্মুখে মরিতে দেখে নাই; মৃত্যুর সম্ভাবনা তাই তাহার মনে ওঠে না। শোভা দিব্য রাঁধে বাড়ে, খাওয়ায় দাওয়ায় এবং সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শয্যা গ্রহণ করিলেই অঘোরে ঘুমাইয়া পড়ে। ছেলের জন্য তাহার চিন্তা হয়, রোগ-যন্ত্রণা দেখিয়া বুক ফাটিয়াও যায়। কিন্তু ছেলের মৃত্যুর আশঙ্কা বুকে জাগে না বলিয়া আহার-নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয় না।

এই নিতান্ত সরলা বধূটির পানে চাহিয়া মিত্র মহাশয়ের বুক আরও হাহাকার করিয়া ওঠে।

ছোটগিন্নী, পদ্মঠাকরুণ এবং বিনোদিনী মা'শায় (ইনি গ্রামের মহাশয়দের বাড়ীর দুহিতা। আর একজন বিনোদিনী থাকায় ইঁহাকে বিনোদিনী মা'শায় বলিয়া অভিহিত করা হয়।) পাড়ার মধ্যে মেয়ে-মহলে মুরব্বি বলিতে এই তিন জনই অবশিষ্ট আছেন। ছোট গিন্নির বয়স নব্বুই পার হইয়া গিয়াছে। কোমর বাঁকিয়া যাওয়ায় উল্‌টা "এল্ ফিগার" করিয়া হাঁটেন। তবে এখনও লাঠী আশ্রয় করিতে হয় নাই। চোখের জ্যোতিঃও বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এতাবৎকাল পাড়ার বিপদে আপদে সর্ব্বাগ্রে হাজির হইতেছিলেন। কিন্তু গত কয়েক বৎসর হইতে কোমরের অশক্ততার জন্য আর পাড়া বেড়াইতে পারেন না। সেই জন্য মিত্র মহাশয়ের পৌত্রের অসুখের সংবাদ যথাসময়ে পৌঁছিলেও, যথাসময়ে হাজির হইতে পারেন নাই।

এতদিন পরে তিনি খোকাকে দেখিতে আসিলেন। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে খোকার মুখচোখ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া মিত্র-গৃহিণীর প্রতি চাহিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, যাহা এতদিনের মধ্যে কাহারও চোখে পড়ে নাই, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা তাঁহার চোখে ধরা পড়িয়া গেল :

—ও কি বউ! মুখ ঢেকে ব'সেছ কেন? খোকার কি হ'য়েছে—কি? মুখ খোলো, মুখ খোলা। ও কিছুই নয়,—উচ্ছিঙ্গে।

তারপরে গাঢ়কণ্ঠে কহিলেন,—আমার নীলমাধব যখন গেল,

ভেবেছিলাম, এ-জীবনে মানুষকে আর মুখ দেখাব না। থাওয়া স্থদ্ধ ত্যাগ ক'রেছিলাম। হায় রে! কালে-কালে পুত্রশোকও সহ্য হ'ল! ভেবেছিলাম, একটা দিনও বাঁচ্‌ব না। কিন্তু পরমায়ুটা একবার দেখ! চার কুড়ি পার ক'রেছি। আরও ক' কুড়ি বাঁচ্‌ব তাই বা কে জানে! যম হয় তো ভুলেই গেছে। নইলে মানুষও আবার এতদিন বাঁচে!

ছোটগিন্নী জোর করিয়া মিত্রজায়ার মুখের ঢাকা খুলিয়া দিয়া আবার বলিলেন,—আমি বল্‌ছি বউ, ও কিছুই নয়,—উচ্চিংড়ে!

মিত্র মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন—উচ্চিংড়ে!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। থেকে থেকে বমি কর্‌ছে তো? তবেই উচ্চিংড়ে। পাতা-ঝরার সময় অমন হয়। কিছু না, একটি উচ্চিংঙ্গে ধ'রে তাই ধুইয়ে দু' ফোঁটা জল ছেলেকে খাইয়ে দাও, দিয়ে মাদুলীর মতন ক'রে গলায় বেঁধে দাও। তিন দিনে ছেলে ভাল হ'য়ে উঠবে। জ্বর নেই, জ্বালা নেই, ও উচ্চিংড়ে। ডাক্তারে নাড়ী দেখে পাবে কি?

ছোট গিন্নী উঠিয়া যাইতেই নন্দকুমার পিতার চিন্তিত মুখের দিকে চাহিয়া, বলিলেন—গলায় বেঁধে দিতে হয় দিন, কিন্তু ধোয়া-জলটল খাওয়ান চল্‌বে না।

সন্ধ্যা হইলে মিত্র মহাশয় একটি হারিকেন লইয়া গোয়াল-ঘরে গেলেন। একটা কোণে গোবর স্তূপ করা ছিল। আলো দেখিয়া কতকগুলা উচ্চিঙ্গা লাফাইয়া উঠিল। মিত্র মহাশয় থপ্‌ করিয়া একটা উচ্চিঙ্গা হাতের মুঠায় ধরিয়া বাহিরে আসিলেন। ইচ্ছা

ছিল, উচ্চিঙ্গা-ধোয়া জল ছেলেটার মুখে দু' ফোঁটা দেন। কিন্তু নন্দকুমারের ভয়ে তাহা পারিলেন না। শুধু একটা সুতায় বাঁধিয়া গলায় ঝুলাইয়া দিলেন।

সে রাত্রি কাটিল। কিন্তু পরদিন সকালেও কিছুমাত্র উপকার দেখা গেল না। ছোট গিন্নী তিন দিনের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিন দিন একটি মাত্র উচ্চিঙ্গার ভরসায় ছেলেকে ফেলিয়া রাখিতে কোন আত্মীয়েরই ভরসা হয় না।

ইত্যবসরে পদ্মপিসী আসিয়া এমন একটি ঔষধ বাৎলাইয়া গেলেন যে, মনের ঈদৃশ অবস্থাতেও নন্দকুমার মুখ টিপিয়া হাসিলেন। রোগটা উচ্ছিঙ্গে কি না তাহা পিসী সঠিক বলিতে পারিলেন না। তবে ইহা যে 'গরম' সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ নাই। এবং পাতা ঝরার সময়ে ছেলেদের এই প্রকার রোগ হয়। তাঁহার একটি ভ্রাতুষ্পুত্রের এই প্রকার যায়-যায় অবস্থা হইয়াছিল। কেবল কাল মুরগীর একটি মাত্র ডিম মাথায় প্রলেপ দেওয়ায় সারিয়া গিয়াছিল।

যাওয়ার সময় পদ্মপিসী বলিয়া গেলেন—তুমি কারও কথা শুনো না বউ, একটি কাল মুরগীর ডিম ভেঙ্গে তার হল্‌দেটা মাথায় প্রলেপ দিয়ে দাও, কালকের মধ্যে 'গরম' কেটে যাবে।

পদ্মপিসী চলিয়া গেলেন। নন্দকুমার হাসিয়া বলিলেন—আমাদের এখানে ডাক্তারের অভাব নেই। সবাই এক একজন অবধূত ডাক্তার!

নন্দকুমার হাসিলেন বটে, কিন্তু মিত্র মহাশয়ের তখন হাসিবার অবস্থা নয়। তাঁহাকে যদি কেহ বলিত, তিনি মাথাটা নীচু করিয়া

পা দুটা আকাশের দিকে তুলিয়া মধ্যাহ্ন বেলায় উঠানে ঘণ্টাকয়েক দাঁড়াইয়া থাকিলে খোকা সুস্থ হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে স্বীকৃত হইতেন।

ঘণ্টাখানেক পরেই তিনি ঠুক্ ঠুক্ করিতে করিতে মুসলমান-পাড়ায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

—বাপু, কাল মুরগীর ডিম একটি চাই। দাম যা লাগে আমি দোব, কিন্তু ডিমটি মিশ্ কাল মুরগীর হওয়া চাই। আমার খোকা ভাই-এর মাথায় প্রলেপ দিতে হবে।

রমজান মিঞা মহাসমাদরে তাঁহাকে বাহিরে বসাইয়া ভিতর হইতে একটি ডিম আনিয়া দিল। কাল মুরগীর ডিম কি না ভগবান জানেন, কিন্তু দাম লাগিল দুই আনা।

মিত্র মহাশয়ের গলায় তুলসীর মালা। বৈষ্ণব অনেক আছে, কিন্তু তাঁহার মত গোঁড়া বৈষ্ণব ক্বচিৎ চোখে পড়ে। কিন্তু সে কথা বোধ হয় তিনি নিজেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। নহিলে নিজে হাতে মুরগীর ডিম বহিয়া আনিতে তিনি প্রাণান্তেও পারিতেন না। শুধু বহিয়া আনা নয়, ডিমটি ভাঙ্গিয়া স্বহস্তে তিনি পৌত্রের মাথায় প্রলেপ লাগাইয়া দিলেন। একটা স্নান, কিম্বা মাথায় একবার গঙ্গাজল ছিটাইয়া লওয়ারও প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

কিন্তু ডিমটা কাল মুরগীর নয় বলিয়াই হউক, অথবা যে কোনো কারণেই হউক, খোকার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। রাত্রিটা কোন রকমে কাটিল বটে, কিন্তু সকালটা আর পার হইবে বলিয়া মনে হইল না। সকালে বিনোদিনী মা'শায়

আসিয়া পদ্মপিসীর ঔষধের অব্যর্থতা সম্বন্ধে অনেক নজির উপস্থিত করিলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কেন যে রোগের উপশম হইতেছে না, তাহারও কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, ডিমের প্রলেপটা যেমন আছে থাক। তাহার উপরেই ছাগলের দুধের সঙ্গে জিরা মরিচ বাঁটিয়া আর একটা প্রলেপ লাগাইয়া দেওয়া হোক।

জিরামরিচ ঘরেই আছে। নূতন পুকুরের পাড়ে কতকগুলি ছাগলকেও প্রায়ই বিচরণ করিতে দেখা যায়। সময় নাই। এক একটি মুহূর্ত্ত এক একটি মণির মতো খোকা ভাই-এর পরমায়ুর মণিহার হইতে খসিয়া পড়িতেছে। যে কোন মুহূর্ত্তেই শেষ মণিটি খসিয়া পড়িতে পারে।

সময় নাই। এই বয়সে তাঁহার মত সম্মানী প্রবীণ লোকের যে মাঠে মাঠে ছাগলের পিছনে ছুটাছুটি করা অশোভন তাহা ভাবিবারও সময় নাই। জীবনের শেষ অঙ্কে আসিয়া আর বুঝি নয়নের আনন্দ, স্নেহের পুত্তলী বংশধরকে ধরিয়া রাখা চলিল না! ঘাটের কাছে আসিয়া এইবার বুঝি জীবনের তরী বাণ্‌চাল হইল!

সময় নাই! মিত্র মহাশয় উঠিলেন। বাড়ীর পিছনেই নূতন পুকুর। ও-পাড়ে সাদা-কাল কয়টি ছাগল চরিতেছে বটে। দুগ্ধবতী কি না কে জানে। মিত্র মহাশয় ছুটিলেন। তাঁহাকে ছুটিতে দেখিয়া ছাগলও ছোটে। তাঁহার কাছা খুলিয়া গিয়াছে। কাপড়ের যে অংশ কোমরের কাছে বেড় দেওয়া ছিল তাহাও পিছনে লোটাইতেছে। বহু কষ্টে একটা ছাগল যখন ধরিলেন,

তখন দুগ্ধ দোহন করিতে গিয়া খেয়াল হইল দোহনের জন্য পাত্র তো আনা হয় নাই!

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়-ভাবে একবার বাড়ীর দিকে চাহিলেন। বাড়ী দূরে নয়। পুষ্করিণীর অপর পাড়েই ওদিকের ঘাটে পাড়ারই কয়েকটি বধূ বাসন মাজিতে আসিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার কাণ্ড দেখিতেছে। অত দূরে নজর চলে না। কিন্তু যেই হউক, অপরিচিতাও কেহ নয়, অনাত্মীয়াও নয়। মিত্র মহাশয়ের মনে হইল, উহাদেরই ডাকিয়া একটা বাটি আনিতে বলেন।

অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল, তাঁহাদেরই বাড়ীতে কে যেন ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মনে হইল, কাণে যেন শুনিতে পান নাই। শুধু মনে হইল, হ্যাঁ, কান্নাই বটে। দেখিতে দেখিতে বহু কণ্ঠের বুক-ফাটা কান্নায় আকাশ যেন চৌচির হইয়া গেল। ঘাটে যে কয়টি বধূ এতক্ষণ তাঁহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়াছিল তাহারা যেন একবার কাণ খাড়া করিয়া সে চীৎকার শুনিয়াই হাতের বাসন ঘাটে ফেলিয়া তাঁহাদেরই বাড়ীর দিকে শশব্যস্তে ছুটিয়া গেল।

হ্যাঁ, কান্নাই বটে! ছাগলটা হাতছাড়া হইয়া একদিকে পলাইয়া গেল। মিত্র মহাশয় সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া শুধু একবার বলিলেন—দাদুভাই গো!

মাঠের কয়েকজন চাষী তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিল। জ্ঞান হইলে, তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। মৃত পৌত্রের দেহ বাহিরে তুলসীতলায় নামানো হইয়াছে। আর তাহাকেই ঘিরিয়া সমস্ত পরিজন আছাড়ি-

পিছাড়ি করিতেছে। মিত্র মহাশয় নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া তাঁহার চিরাভ্যস্ত আসনটিতে আসিয়া বসিলেন। অভ্যাসবশে উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন, পাটের গোছা খুঁটিতে বাঁধা নাই। সম্মুখে ঠাকুরঘরে দৃষ্টি পড়িতে দেখা গেল, হনুমানে লাফ দিয়া দিয়া চালের খানিকটা স্থান গর্ত্ত করিয়া দিয়াছে। আপন মনেই মিত্র মহাশয় বলিলেন, কাল ওখানটা মেরামত করিতে হইবে।

উত্তরাধিকারী

আমাদের ও অঞ্চলে হিজলডাঙ্গার দত্তদের চেনে না এমন লোক নাই। অবস্থা যে তাহাদের ভালোই ছিল সে সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু নাম তাহাদের বড় লোক বলিয়া নয়। বড়লোক তো কতই থাকে। তাহাদের বাড়ীর কয়েক রশি দূরেই তো একটা রাজবাড়ী ছিল। সে রাজবাড়ীর অর্দ্ধেক আজ গঙ্গাগর্ভে, আর অর্দ্ধেক ইষ্টক-স্তূপে পরিণত হইয়াছে। প্রথম দেউড়িটা এখনও বোঝা যায় বটে, কিন্তু তারপরেই এমন ঘন জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে যে, সেদিকে যায় কাহার সাধ্য! সে বাড়ীর কোথায় কি ছিল জানিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। ফলে, লোকের মুখে-মুখে বিগত রাজৈশ্বর্য্য লক্ষগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এখন শুনিলে মনে হয়, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য দিল্লীর বাদশাহের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। সে বংশের কে যে কোথায় আছে এবং কি ভাবেইবা কালাতিপাত করিতেছে কেহ তাহার সংবাদ পর্য্যন্ত রাখিবার প্রয়োজন বোধ করে না। অথচ দত্তরা তো তাঁহাদেরই মুন্সি ছিল। কিন্তু ওই-অঞ্চলের কে তাহাদের না জানে, আর কে-ই বা খাতির না করে। অবস্থায় আজ তাহাদেরও ভাটা পড়িয়াছে। মস্ত বড় চকমিলান বাড়ীটাই যা। বালাখানার দরদালানে বসিয়া বাড়ীর মালিকেরা এখনও মুখস্থ চপটাৎ রাজা-উজির মারেন বটে, কিন্তু পাড়ার ছেলেরা মিলিয়া বালাখানায় যদি লাইব্রেরী না বসাইত তাহা হইলে চামচিকার উৎপাতে ও-ঘরে আর বসা চলিত না। মালিকেরা তো সকলে সুদূর অন্দরের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, আর নিজের-নিজের সুবিধামত এদিক-

ওদিক দরজা ফুটাইয়া বাহিরে যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। সরিকও তো কম নয়। কাহারও ভাগে দুইটি ঘর আর একটা বারান্দা, কাহারও বা একটিমাত্র ঘর আর আধখানা বারান্দা। এমনি করিয়া অতগুলি লোক ঠাসিয়া-ঠুসিয়া অন্দর বাড়ীতে বাস করিত।

তবে হ্যাঁ, মনোময়ের গুণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বালাখানার ছাদ মেরামত হইতে আরম্ভ করিয়া বাহির মহলের যত কিছু জোড়া-তালি সে নিজের পয়সা খরচ করিয়া করিয়াছে। কিন্তু সে-ও তো সব শ্বশুরের কল্যাণে। এম-এ পাশ তো আজকাল অনেকেই করিতেছে! কিন্তু সরকারী দপ্তরখানায় অমন ভালো চাকরীটি শ্বশুর না থাকিলে আজকালকার দিনে কে বাগাইতে পারে! তবে সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, চাকরী যেই জোটাইয়া দিক গাঁটের পয়সা পাঁচজনের কাজে খরচ করিতে যে পারে তাহার মন ছোট নয়।

এই তো দত্তদের বর্ত্তমান অবস্থা। কিন্তু নামডাক তাহার চেয়ে অনেক বেশী। এবং কলিকাতা সহরে যদিচ মনোময়কে রায়বাহাদুরের জামাই বলিয়াই লোকে জানে, তাহাদের ও-অঞ্চলে সেই রায়বাহাদুরের নামও কেহ শোনে নাই। সেখানে তাহার বড় পরিচয় হিজলডাঙ্গার দত্তদের ছেলে বলিয়াই। এমন কি তাহার নামের পিছনের এম-এ উপাধিটাও বাহুল্য মাত্র।

এত বড় নাম-ডাকের হেতু যিনি, তিনি বহুকাল হইল গত হইয়াছেন। তখন দত্তদের জমজমাট অবস্থা। বঙ্কুবাবু দুইহাতে সেই ধন বিতরণ করিতেন। বাড়ীতে দানসত্র, সদাব্রত তো

ছিলই, উপরন্তু ত্রিশ মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে এমন গ্রাম ছিল না যেখানে তিনি অন্ততঃ একটি পুষ্করিণীও খনন করেন নাই এবং শীতকালে অন্ততঃ দুইশত কম্বলও বিতরণ করেন নাই। শেষ জীবনে তিনি অকস্মাৎ সমস্ত ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। সেখানে বহু টাকা ব্যয়ে একটি প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া এবং সেই মন্দিরের শ্রীশ্রীরাধামাধব জিউর সেবার জন্য যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দান করিয়া নিজে মাধুকরী দ্বারা জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। দান করিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই থাকে। কিন্তু কোনো বড় দাতার অথবা ত্যাগীর দানের অথবা ত্যাগের মর্য্যাদা আর কেহ না বুঝুক এই বাংলা দেশের লোকে বোঝে। তাই বঙ্কুবাবু যদিও আজ নাই, এবং তাঁহার পরিত্যক্ত সে বিপুল সম্পত্তিরও অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে তথাপি দত্তবংশের মর্য্যাদা আজও চারিপাশের লোক অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

মনোময় মোটা টাকা মাহিনা পায় এবং গ্রামের উপর তাহার যথেষ্ট মমতাও আছে। গ্রামের অথবা পার্শ্ববর্ত্তী কোনো গ্রামের কোনো জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তাহার যথাসাধ্য সাহায্য হইতে বঞ্চিতও হয় নাই। তবু তাহার পূর্ব্বপুরুষের দান লোকের মনের এতই উঁচুতে দাগ কাটিয়া গিয়াছে যে, তাহার কোনো দানই লোকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত বলিয়া মনে করিতে পারে না।

দত্তবংশের দানশীলতা মনোময় উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে। কেবল একটি বিষয়ে বংশের আর সকলের হইতে সে পৃথক! ইহাদের সকলেই ভক্তিমার্গের পথিক, জ্ঞানমার্গের নয়। এণ্ট্রান্স ফেল করিয়া সকলেই গুরুর নিকট মন্ত্র লইয়াছে। প্রত্যেকের কণ্ঠে

তুলসীর মালা, মাথার চুল ছোট-ছোট করিয়া ছাঁটা, তাহার উপর গোক্ষুর পরিমাণ একটি শিখা। বাড়ীতে বিগ্রহ দেবতা আছেন, তাঁহার ভোগ না হইলে কুড়ি বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক কেহ জলগ্রহণ করে না। দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি অপরিসীম। এবং শুধু সুশোভন বিনয় ও সুমার্জ্জিত ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া গ্রামের সহস্র ছেলের মধ্যে দত্তবাড়ীর ছেলেদের অতি সহজেই বাছিয়া লওয়া যায়।

কেবল মনোময়ই এ বংশের একটি ব্যতিক্রম। তাহার মাথার চুল হাল-ফ্যাশানে ছাঁটা, শিখা নাই। গলায় তুলসীর মালাও নাই। পাতলা ছিপছিপে দেহ, সর্ব্বদা চঞ্চলভাবে ছট্‌ফট্‌ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। বৈষ্ণবোচিত নেয়াপাতি ভুঁড়ি নাই,—ধীর নম্র কণ্ঠ নাই,—মৃদু ক্ষীণ হাসিও নাই। কোনো কাজ করিবার সময় আর সকলে যখন কিংকর্ত্তব্য বিবেচনা করে সে তখন সে কাজ শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার কথাও কোমলতাবিহীন। দ্বারে ব্রাহ্মণ প্রার্থী আসিলে সকলে কিছু দিক আর না দিক সমাদর করিতে ত্রুটি করে না,—বড় ভাই চিন্ময় উপস্থিত থাকিলে তো পাদোদকও আদায় করিয়া লয়। কিন্তু তাহার কাছে সে সব নাই! ব্রাহ্মণ দেখিয়া সে উঠিয়াও দাঁড়ায় না। হয় তো আবেদন আধখানা শুনিয়াই পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া মেঝেয় ছুঁড়িয়া দেয়, বই হইতে মুখ তুলিয়া দেখেও না কে প্রার্থী। আর যদি মুখ তোলে তো ভিক্ষাবৃত্তি সমাজের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর সে সম্বন্ধে রুক্ষভাষায় একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া দেয়। এই সকল কারণে গ্রামে তাহার কিছু অখ্যাতিও আছে।

অনেকে এই জন্য তাহার স্ত্রী বিভারাণীকে দায়ী করেন। কথাটা হয় তো একেবারে মিথ্যা নয়। বি-এ পড়িবার সময় রায়বাহাদুরের গৃহে তাহার বিবাহ হয়। তখন পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের সকল চিহ্নই তাহার ছিল। বিবাহের কিছুদিন পরেই গেল টিকী, তারপরে মালা। তারপরে বাড়ীর লোকে সবিস্ময়ে দেখিল মনোময় আহ্নিকও করে না, বিগ্রহের ভোগ হওয়া পর্য্যন্ত আহারের জন্য অপেক্ষাও করে না। বিভারাণী সকালে উঠিয়াই তাহার জন্য ষ্টোভে দু'খানা লুচি ভাজিয়া দেয়, আর একটু চা। আটটা বাজিতে না বাজিতে পান চিবাইতে চিবাইতে মনোময় বাহিরে আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া নিবিষ্টমনে পড়িতে বসে। ব্যাপার দেখিয়া বাড়ীর লোকেরা মুখ টিপিয়া হাসে। কিন্তু যে-ছেলে দু'দিন পরেই অবধারিত গ্র্যাজুয়েট হইবে তাহাকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেও সাহস করে না।

—হবে না? অত বড় ধিঙ্গি বৌ! তখনি বলেছিলাম দাদাকে ··

কিন্তু দাদা, অর্থাৎ মনোময়ের পিতা কি করিবেন? অত বড় ধিঙ্গি বৌ, বিশেষ সহুরে মেয়ে আনিতে তাঁহারই কি ইচ্ছা ছিল? কিন্তু অতগুলো টাকা! তাহার সিকিও তো কেহ দিতে রাজী হয় নাই। হইলে কি আর তিনিই এ বিপত্তি ঘাড়ে লইতেন?

পালকী হইতে নামিতে না নামিতেই বিভা একজোড়া স্যাণ্ডাল

পায়ে দিয়া একটা তোয়ালে কাঁধে ফেলিয়া বাপের বাড়ীর ঝিকে বলিল,—জিগ্যেস কর্ তো হরির মা, এ বাড়ীর বাথ্‌রুমটা কোথায় ?

হরির মাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, মনোময়ের মা হন্ হন্ করিয়া সেই ঘরে আসিতেছিলেন, নববধূর কথা শুনিয়া আর পায়ে জুতা দেখিয়া তিনি একহাত ঘোমটা টানিয়া সরিয়া পড়িলেন।

মনোময়ের মা অতি নিরীহ মানুষ। হাঙ্গামায় থাকিতে ভালোবাসেন না। বধূকে একবার দেখিয়াই বুঝিলেন, এখানে শাশুড়ীপণার সুবিধা হইবে না। সুতরাং আগে থাকিতে সরিয়া পড়াই ভালো।

কিন্তু বিভারও দোষ ছিল না। কলিকাতায় এত বড় বাড়ী যাহাদের আছে তাহারা বহু লক্ষ টাকার মালিক। এত বড় বাড়ীতে যে বাথ্‌রুম নাই, এ কথা সে ভাবিতেও পারে নাই।

মনোময়ের মা পলাইয়া বাঁচিলেন, আসিল ছোট বোন জয়া। এ বাড়ীতে সে-ই একমাত্র মেয়ে যাহার স্বামী বাড়ীতে বসিয়া জোতজমা দেখে না, আপিসে চাকরী করে। এজন্য বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে সমীহও করে, হিংসাও করে। সহুরে মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতে যদি কেউ পারে তো সে জয়া।

জয়া বলিল, বাথ্‌রুম কি হবে বৌদি ? অমন চমৎকার খিড়কীর পুকুর রয়েছে, এরা বাথ্‌রুম করতে যাবে কোন দুঃখে ?

বিভারাণী তাড়াতাড়ি বলিল, সেই খিড়কীর পুকুরটাই দেখিয়ে দাও ভাই, গরমে প্রাণ যায়।

বিভার কথা ভারি মিষ্টি, আরও মিষ্টি তাহার হাসি। এক মুহূর্ত্তেই জয়া তাহার ভক্ত হইয়া উঠিল। এমন কি বৌদির জুতা পরার লজ্জা লঘু করিবার জন্য নিজেও জুতা বাহির করিয়া পায়ে দিয়া বসিল। দিল্লীতে স্বামীর কাছে থাকিতে সে নিজেও জুতা পরে। বাপের বাড়ীতে বাক্সের ভিতর তুলিয়া রাখে।

কিন্তু তাহাতেও লোকের মুখ বন্ধ হইল না। তাহারা বিভাকে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে বেশ রস জমাইয়া তুলিল। জয়া আর কত লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিবে?

রাত্রে মনোময় এই লইয়া একটু অনুযোগ করিয়াছিল।

—ক'টা দিনই বা এখানে আছ বিভা, এ ক'টা দিন জুতো নাই পরলে!

বিভা হাসিয়া বলিল, পরবনা-ই ভেবেছিলাম। কিন্তু যা তোমাদের মেঝে! লজ্জা ক'রে নিজের পা'কে কষ্ট দিয়ে লাভ কি, বল?

মনোময় আর কিছু বলে নাই, শুধু একটু হাসিয়াছিল।

—হাসলে যে?

—এমনিই।

কিন্তু বিভা ছাড়িল না। কেন হাসিল সে কথা বলিতেই হইবে।

মনোময় হাসিয়া বলিয়াছিল, ভাবছি, এ জুতো ছিঁড়লে তারপরে কি পায়ে দেবে?

বিভা স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবদার করিয়া বলিয়াছিল, কেন? তুমি কিনে দিতে পারবে না?

—তাহ'লে এখন থেকেই জলখাবারের পয়সা থেকে জমাতে হয়।

স্বামীর মুখ চাপা দিয়া বিভা বলিয়াছিল, থাক্ থাক্। এ জোড়া ছিঁড়লে খালি পায়েই বেড়াব। কিন্তু থাকতে কষ্ট করব কেন? জুতো পরা কি খারাপ?

মনোময়ের মনে যাই থাক, মুখে বলিয়াছিল, না।

জুতার কষ্ট বিভারাণীর কখনও হয় নাই। এম-এ পাশ করার পর মনোময়কে দুইটা মাসও বসিয়া থাকিতে হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারিয়েটে একটা ভালো চাকরী জুটিয়া যায়।

আরও কিছুদিন পরে একটি ছেলে হইল। সেও এক ব্যাপার।

ছেলের নামকরণ লইয়া বিভাতে ও মনোময়ে তুমুল বিতর্ক বাধিয়া গেল। সেটা ১৯২২ সাল। চাকরী ছাড়িয়া দিবার জন্য মনোময় ভীষণ জেদ ধরিয়া বসিল। অপর পক্ষে বিভা ও রায়বাহাদুর কিছুতে তাহাকে চাকরী ছাড়িতে দিবে না। মনোময় পুরুষ মানুষ, গাছতলায় রাত কাটাইতে পারে। কিন্তু বিভা তো সত্যিই কচি ছেলে লইয়া গাছতলায় আশ্রয় লইতে পারে না। চাকরী ছাড়িলে তাহারা খাইবে কি?

মনোময় বলিল, যদি আমি এম-এ পাশ না করতাম তাহ'লে খেতাম কি?

বিভা রাগিয়া বলিল, কচু সেদ্ধ আর ভাত। তাহ'লে তোমার সঙ্গে আমার বিয়েও হ'ত না।

মনোময় আর কথা কহিল না। দিন-রাত্রির অধিকাংশ সময় বাহিরে-বাহিরে কাটাইতে লাগিল। কিন্তু খামখা বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে তাহার ভালোও লাগে না, পারেও না। অবশেষে একদিন শ্রান্ত হইয়া পড়িল এবং বাড়ী ফিরিয়া জেদ ধরিল ছেলের নাম রাখিবে চিত্তরঞ্জন।

দেশে চিত্তরঞ্জনের তখন অসামান্য প্রভাব। তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার শৌর্য্য, তাঁহার অকৃত্রিম দেশপ্রীতির কাছে আসমুদ্র হিমাচল মাথা নত করিয়াছে। তাঁহার কথা যখনই মনোময় ভাবে, মনে হয় যেন তাহারই আদর্শ, তাহারই সমস্ত জীবনের স্বপ্ন রক্তমাংসের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। শুধু তাহার আদর্শ নয়, সমস্ত বংশের আদর্শ, যে আদর্শের প্রেরণায় বঙ্কুবাবু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মাধুকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবের সেই সর্ব্বোচ্চ আদর্শের তাহার চেয়ে বড় উত্তরাধিকারী আর কে হইতে পারে? বঙ্কুবাবুর বংশধরকে দেশবন্ধুর ত্যাগ যেন কেবলই লজ্জা দিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার যে হাত-পা বাঁধা। বিভা কিছুতেই তাহার সঙ্গে রাজপথে নামিবে না। বঙ্কুবাবুর উদ্দেশে হাতজোড় করিয়া সে বারম্বার মার্জ্জনা চাহিল। অধম সে, অকৃতি সে, দত্তবংশের মুখ উজ্জ্বল করিবার শক্তি থাকিতেও পঙ্গু। মানুষের জীবনে ইহার চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কি হইতে পারে? বঙ্কুবাবুকে সহস্র প্রণাম জানাইয়া মনে মনে বলিল, তাহার নিজের জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে যাক্, কিন্তু পুত্রের জীবন সে ব্যর্থ হইতে দিবে না,

কোনোক্রমেই না। জীবনের কর্ম্মপথের সন্ধান মিলিবার পূর্ব্বেই এমন করিয়া বিবাহের বন্ধনে তাহার হাত-পা বাঁধিয়া দিবে না। তাহাকে সে সর্ব্বপ্রযত্নে মানুষ করিবে, সত্যকার মানুষের মতো মানুষ।

সে জেদ ধরিয়া বসিল, ছেলের নাম রাখিবে চিত্তরঞ্জন।

বিভারাণী কথা কহে না বটে, কিন্তু স্বামীর চিন্তাধারার খবর রাখে। নামকরণের পিছনে স্বামীর যে মনোভাব তাহা ভাবিয়া একটু দ্বিধাভরে কহিল, চিত্তরঞ্জন? বাবা নাম রেখেছেন···

মনোময় ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, অথবা বিবেকানন্দ।

বিভা অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেয়ে। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, বরং চিত্তরঞ্জনই ভালো।

মনোময় সাগ্রহে বলিল, ভালো নয়? খুব ভালো নাম। আমার তো খুব পছন্দ হয়।

বিভারও পছন্দ হইয়াছে। ছেলের নাম চিত্তরঞ্জনই রাখা হইল। এবং মনোময় আগের মতোই উৎসাহে আফিস করিতে লাগিল।

চিত্তরঞ্জন তাহার চোখের সুমুখে হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলা ক'রে, মনোময় গভীর মনোযোগের সঙ্গে চাহিয়া-চাহিয়া দেখে।

কাজের ফাঁকে মাঝে-মাঝে ঘরে আসিয়া বিভারাণী স্বামীর কাণ্ড দেখিয়া হাসে।

—অমন উপুড় হ'য়ে ছেলের মুখে কি খুঁজছ বল তো ?

মনোময় অপ্রস্তুত হইয়া উঠিয়া বসে। বলে, খোকার মুখটা কার মতো হয়েছে বল তো ? হাঁ-মুখটা ঠিক বাবার মতো, না ?

—তবে তো সবই বুঝেছ !

বিভা খোকার বিছানার কাছে সরিয়া আসে। গভীর স্নেহের মৃদু প্রকাশ তাহার ঠোঁটের ফাঁকের হাসিতে ফুটিয়া ওঠে।

বলে, হাঁ-মুখটা হয়েছে বরং আমার বাবার মতো। আর চিবুকের কাছটা, চোখ আর ভুরু তোমার মতো। চিবুকের কাছটা তো অবিকল তোমার মতো !

—অবিকল আমার মতো ? দেখি, দেখি, আয়নাটা ?

মনোময় তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া আয়না পাড়িয়া আনিল। আয়নায় একবার নিজের চিবুকটা দেখে আর খোকার চিবুকের সঙ্গে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করে। কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পরিণত বয়স্কের চিবুকের সঙ্গে কচি শিশুর চিবুকের মিল খুঁজিতে যে দৃষ্টির প্রয়োজন তাহা মনোময়ের নাই। সে সন্দিগ্ধভাবে নিজের চিবুকের একস্থানে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করে, এই খানটার কথা বলছ, না ?

বিভা তাহার চিবুকটা নাড়িয়া দিয়া বলিতে-বলিতে চলিয়া যায়, হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। ঠিক ওইখানটা ! তোমার বুদ্ধি কত ?

মনোময় অপ্রস্তুতভাবে হাসে। শত চেষ্টা করিয়াও সে ছেলের মুখের কোনো স্থানের সঙ্গে কাহারও মুখের মিল খুঁজিয়া পায় না। বরং দেখে, শিশুর মুখ দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দু'মাসের ছেলের

মুখের সঙ্গে ছ'মাসের ছেলের মুখের এবং ছ'মাসের ছেলের মুখের সঙ্গে এক বৎসরের ছেলের মুখের আকাশ-পাতাল তফাৎ। সে আর কিছুতেই দিশা পায় না।

ছোট ছেলে। বিছানায় শুইয়া-শুইয়া মাথার উপর ঝোলানো কাগজের রঙীণ ফুলটির দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে। সেটিকে ধরিবার জন্য হাত-পা ছোঁড়ে। মনোময়ের বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

বিভাকে ডাকিয়া বলে, দেখ, দেখ,—মোটে চার মাস তো বয়েস। কেমন ক'রে চাইছে দেখ! যেন এখুনি ও সব জিনিস জানতে চায়!

বিভার নিজের যদিও এইটি প্রথম ছেলে, কিন্তু অনেক ছেলেই তো ঘাঁটিয়াছে। সে মৃদু মৃদু হাসে। পরিহাস করিয়া বলে, তোমারই মতন ওর বুদ্ধি হবে।

কিন্তু মনোময়ের তখন পরিহাস বুঝিবার মতো মনের অবস্থা নয়। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে খোকার পানে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলে, উঁহুঁ, আমার চেয়ে বেশী।

এমনি করিয়া আদরে-আব্দারে চিত্তরঞ্জন বড় হইতে লাগিল।

তাহার নূতন-নূতন দামী-দামী জামা, তাহার প্যারাম্বুলেটার, তাহার ভালো-ভালো খাবার, মনোময় কোথাও আর ত্রুটি রাখিল না। চারি বৎসর এমনি চলিল। এবং এই চারি বৎসরে

তাহার উপদ্রবে বাড়ীর লোক বিব্রত হইয়া উঠিল। কিন্তু মনোময়ের ভয়ে তাহাকে একটা কড়া কথা বলিবার সাধ্য কাহারও ছিল না।

কিন্তু চিত্তরঞ্জন পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিতেই একটা বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল,—এবং একদিনে।

নূতন নূতন দামী জামা বাক্সে উঠিল, পরিধানের জন্য ব্যবস্থা হইল মোটা খদ্দরের হাফ্‌প্যাণ্ট ও হাত কাটা সার্ট। প্যারাম্বুলেটারটা এককোণে সরাইয়া রাখা হইল, তাহাতে চড়া নিষেধ। খাবার জন্য দেশ হইতে আসিল লাল-লাল চিঁড়া এবং আখের গুড়। এবং মনোময় একদিন নাপিত ডাকিয়া তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদামের লাঞ্ছনার একশেষ করিল।

জামা-কাপড় প্যারাম্বুলেটার এমন কি লাল চিঁড়া ও আখের গুড়ের জন্যেও বিভা ততটা আপত্তি জানাইল না। কিন্তু অমন চমৎকার চুলগুলি ছাঁটিয়া দেওয়ায় তাহার মন ভারী হইয়া উঠিল। তথাপি মুখে কিছুই বলিল না। চাকরী ছাড়ার খেয়াল এইদিকে মোড় ফিরিয়াছে, এখন বাধা দিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না।

কিন্তু তাহার মন কি কারণে ভারী হইয়া উঠিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার মনোময়ের তখন নিতান্তই সময়াভাব। স্বদেশী আন্দোলন তখন জোর চলিয়াছে। আফিসে যখন-তখন দুই-তিনজন মিলিয়া তাহারই ঘরে জটলা পাকায়। রুগ্ন উত্থানশক্তিহীন দেশবন্ধু ষ্ট্রেচারে করিয়া কাউন্সিলে আসিয়াছিলেন। বাংলার চারিজন নেতা তাঁহার ষ্ট্রেচারের পায়া ধরিয়া তাঁহাকে বহিয়া আনিয়াছিলেন।

আফিসের কেরাণীর জীবনে স্বচক্ষে কোনো ঘটনা দেখিবার সুযোগ কমই মেলে। কিন্তু কাণে-শোনা ঘটনা যখন তাহারা আফিস ঘরের অথবা চায়ের দোকানের টেবিল চাপড়াইয়া বিবৃত করে তখন কে বলিবে, এ ঘটনা তাহাদের চোখের সম্মুখে সংঘটিত হয় নাই!

নিজের টেবিলে বসিয়াই মনোময় শোনে,—শোনে নয়, যেন চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতে পায়,—দেশবন্ধুর শীর্ণ মুখের উপর শান্ত ম্লান ছায়া পড়িয়াছে, দু'টি শিথিল বাহু কোলের কাছে বদ্ধাঞ্জলি, চোখ দু'টি থাকিয়া-থাকিয়া উত্তেজনায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু তখনই আবার অবসাদে গভীর শ্রান্তিতে স্তিমিত হইয়া আসিতেছে···

মনোময় স্পষ্ট দেখিতে পায়। আফিসের বন্ধুরা কখন গল্প শেষ করিয়া চলিয়া যায় সে জানিতেও পারে না। কিন্তু তাহার কলম আর চলে না। মাথা সম্মুখের স্তূপীকৃত কাগজের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে, যেন .ঘাড়ের বাঁধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। শূন্য দৃষ্টির ফাঁক দিয়া মন তাহার বাঁধনহারা মেঘের মতো কোথায় উড়িয়া চলে কে জানে!

বাড়ী ফিরিয়া এক কাপ চা ও কিছু খাবার খাইয়াই সে চিত্তরঞ্জনকে মুখে-মুখে শিখাইতে বসে, এই পৃথিবীর আকার কিরূপ, কেমন করিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে; দিন ও রাত্রির সৃষ্টিরহস্য কি। সে কতকগুলি মাটির মডেল কিনিয়াছে। পাহাড়ের মাথায় জল ঢালিয়া বুঝাইয়া দেয় নদীর গতি-পথের কথা। মাটির গোলকের উপর পিপীলিকা বসাইয়া গোলকটিকে প্রাণপণে

ঘুরায়। বুঝাইয়া দেয়, কেন এই ভূমণ্ডল সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে থাকিলেও আমরা পড়িয়া যাই না। এমনি আরও কত কথাই সে খেলাচ্ছলে বালককে বুঝাইয়া দেয়।

সকাল এবং সন্ধ্যা চিত্তরঞ্জনের বই পড়ার সময়,—সকালে এক ঘণ্টা এবং সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা। ছোট ছেলের বেশী পড়া ঠিক নয়।

বিভারাণী সমস্ত ব্যাপারটিকে মনে-মনে পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিত। স্বামীকে দিনরাত্রি ছেলে লইয়া এমনি মাতিয়া থাকিতে দেখিয়া মাঝে-মাঝে তাহার মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্বন্ধেও আশঙ্কা করিত। কিন্তু কয়েকদিন যাইতে না যাইতে ছেলের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং তাহার পড়ার উন্নতি দেখিয়া সে পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জন যে সাধারণ বালক নয়, তাহার মেধা যে সাধারণ বালকের চেয়ে অনেক প্রখর, এ বিষয়ে তাহারও আর সংশয় রহিল না। এবং শেষ পর্য্যন্ত স্বামীর সঙ্গে সেও একমত হইল যে, ভবিষ্যতে এই চিত্তরঞ্জনও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতো তাহার দেশের, দশের এবং বিশেষ করিয়া দত্ত বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে।

আট-নয় বৎসর বয়সের সময় চিত্তরঞ্জন যখন বাপের কাছে শোনা অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্প বলিতে লাগিল তখন বিভা শুধু বিস্ময়ে নয় শ্রদ্ধায়ও অভিভূত হইয়া উঠিল। লেখাপড়া সে-ও কিছু করিয়াছে। কিন্তু এ সকল সে কোনোদিন শোনে নাই।

এক-এক দিন এক-এক রকমের কথা।—

—জানো মা, এই পৃথিবী একদিনে তৈরী হয় নি। একদিন ছিল যেদিন কিছু ছিল না,—সূয্যি না, চাঁদ না, পৃথিবী না, কিচ্ছু

না,—এমন কি হাওয়া পর্য্যন্ত ছিল না। শুধু ছিল ছোট্ট ছোট্ট নেব্যুলা···

আশ্চর্য্য! আট-নয় বৎসরের ছেলে পিতার গল্প বলিবার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত অবিকল আয়ত্ত করিয়াছে!

বিভা বিস্মিতদৃষ্টিতে ততোধিক বিস্মিত স্বামীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে, সত্যি?

গর্ব্বিত পুলকে মনোময় ঘাড় নাড়িয়া বলে, হুঁ।

বাপের সমর্থনে চিত্তরঞ্জন আরও উৎসাহিত হইয়া মাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল,—আচ্ছা, তুমি প্রমাণ কর তো দেখি, পৃথিবীটা গোলাকার।

বিভা হাসিয়া বলিল, গোল-ফোল জানি না বাপু, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চ্যাপ্‌টা।

চিত্তরঞ্জন মায়ের অজ্ঞতায় হাসিয়া আকুল হইল। কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত সমস্তটা দুলাইয়া বলিল, চ্যাপ্‌টা মোটেই নয় মা, রীতিমত গোল। চ্যাপ্‌টা! হিঃ হিঃ!

একটু থামিয়া নিজের ভুল সংশোধন করিয়া বলিল, কেবল উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। না বাবা?

চিত্তরঞ্জন বাহিরে গেলে বিভা বলিল, ও দেখবে তোমার চেয়েও অল্প বয়সে এম-এ পাশ করবে।

মনোময় হাসিয়া বলিল, এম-এ নয় গো,—এম-এ তো আজকাল সবাই পাশ করছে। ওকে তারও চেয়ে বড় হতে হবে,—ওরই নামের আর একজনের মতো কিম্বা তাঁরও চেয়ে বড়।

আনন্দে তাহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল।

ইহারই মাসখানেক পরে মনোময় একদিন একখানা চিঠি লইয়া হাসিতে হাসিতে উপরে আসিল।

—ওগো, রুণুর বিয়ের যে সব ঠিক হ'য়ে গেল। এতদিনে একটা দুর্ভাবনা ঘুচ্‌ল।

রুণুর বিবাহ লইয়া মনোময় যে এতদিন দুর্ভাবনায় দিন কাটাইতে ছিল এ সংবাদ বিভা পায় নাই।

সে হাসিতে-হাসিতে বলিল, কই, চিঠি দেখি?

তাহার হাতে চিঠিখানি দিয়া মনোময় চিত্তরঞ্জনকে লইয়া পড়িল,—ওরে তোর দিদির যে বিয়ে!

চিত্তরঞ্জন খেলা করিতেছিল। হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কবে? কবে?

—আষাঢ় মাসে। তোরা সবাই যাবি যে।

চিঠি পড়িতে পড়িতে বিভার মুখ কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। চিঠিখানা স্বামীর গায়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে তো হবে। কিন্তু টাকার কি ক'রে যোগাড় হবে শুনি?

চিত্তরঞ্জনের গালে কি করিয়া কালি লাগিয়া গিয়াছিল। রুমাল দিয়া গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে তাহা মুছিতে-মুছিতে মনোময় নিশ্চিন্তভাবে বলিল, সে হ'য়ে যাবে অখন।

বিভা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, হ'য়ে তো যাবে। কিন্তু কি ক'রে? তোমার কি ব্যাঙ্কে হাজার টাকা জমা আছে?

মুখ কাঁচুমাচু করিয়া মনোময় বলিল, ব্যাঙ্কে আর কি ক'রে থাকবে? প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে তুলতে হবে আর কি।

বিভা আর দাঁড়াইল না। গট্ গট্ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সমস্ত দিন সে ভালো-মন্দ কোনো কথা কহিল না। তাহার থম্‌থমে ভাব দেখিয়া মনোময়ও সাহস করিয়া কাছে ঘেঁসিতে পারিল না। সে-ও আড়ালে-আড়ালে ফিরিতে লাগিল।

সমস্ত দিন এমনি থম্‌থমে ভাব চলিল। বর্ষণ আরম্ভ হইল রাত্রে,—যেমন বর্ষণ তেমনই ঝড়। বিভারাণী একেবারে বেঁকিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে আমি কিছুতে হাত দিতে দোব না।

মনোময় বিস্মিতভাবে বলিল, তাহ'লে আমি টাকা পাব কোত্থেকে? বা রে!

বিভা কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিল। বলিল, সে আমি জানি না। কিন্তু কাল যদি তোমার ভালো-মন্দ কিছু হয়, তাহ'লে আমি দাঁড়াব কোথায় বল তো?

মনোময় যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, তার মানে? তবে দাদারা রয়েছেন কি করতে?

বিভা এক ধমক দিল। কহিল,—দেখ, ন্যাকামি কোরো না। সবারই দাদা সব করলে, এখন তোমার দাদাই বাকী র'য়েছেন। আজ টাকার দরকার পড়েছে তাই ভায়ের খোঁজ নেওয়া হয়েছে, নইলে কোন খোঁজটা তোমার নেন, শুনি? এই যে এবারে এত আম হ'য়েছে, কাক-পক্ষীতে নষ্ট ক'রে ফেলে দিচ্ছে, তোমাদের জন্য ক'টা আম এসেছে হিসেব দাও তো?

—ক'লকাতায় কি আম কম আছে না কি?

—তাই ব'লে বাগানের আম পাঠাবে না? আমাদের জন্যে না হয় নাই পাঠালেন। কিন্তু ছেলেটার জন্যেই বা ক'টা পাঠালেন?

এইবার মনোময় বিরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল, সেখানেও কি ছেলেপুলে নেই নাকি?

অকস্মাৎ ও-পাশের বিছানা হইতে শিশুকণ্ঠের ঝঙ্কার উঠিল, আর আমি বুঝি আম খেতে জানি নে?

আজ চিত্তরঞ্জন যে এখনও জাগিয়া আছে তাহা কেহই জানিত না। সাধারণতঃ বেশী রাত্রি সে জাগে না, সকাল সকাল ঘুমাইয়া পড়ে। আজও যথাসময়েই নিদ্রা গিয়াছিল। কিন্তু ইহাদের দু'জনের চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

বিভা বলিল, ওই শোনো।

এই ব্যাপারে ছেলেমানুষকে কথা কহিতে দেখিয়া মনোময় প্রথমটা ক্রোধে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়াছিল। কিন্তু বিভার কথায় হাসিয়া ফেলিল।

কহিল, কেন? তোর দুঃখুটা কি? তুই কি আম খেতে পাচ্ছিস না?

চিত্তরঞ্জন লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—তাই বলে নিজের বাগানের আম,—বা রে!

নিজের বাগানের আমের জন্য যে চিত্তরঞ্জনের মনে এত ক্ষোভ জমা হইয়াছিল, এ সংবাদ কোনো দিন সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই। আমের তাহার অভাব নাই, সুতরাং লোভও থাকিবার কথা নয়। মনোময় স্বচক্ষে দেখিয়াছে হাতের আম

চিত্তরঞ্জন অকাতরে ভিখারীকে দিয়া দেয়। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে শুধু বিভার পানে চাহিয়া রহিল।

সে চাহনির মধ্যে একটা দাহ ছিল। বিভা কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, তা কি করবে? ও আমার মতন হয়েছে। উচিত কথা পষ্টাপষ্টি ব'লে দেয়।

মনোময় মনে-মনে ভাবিল, তাই হবে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মনোময়কে হার মানিতে হইল।

দাদার নিকট বহু প্রকার বিনয় করিয়া এবং বহুবার দুঃখপ্রকাশ করিয়া মনোময়কে লিখিয়া দিতে হইল যে, হাজার টাকা দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত। সেই সঙ্গে উপসংহারে পুনশ্চ করিয়া ইহাও লিখিয়া দিল যে, অমন পাত্র পাওয়াও দুষ্কর। সুতরাং যে-কোনো উপায়েই হউক ওইখানেই বিবাহ দিতে হইবে।

উত্তর আসিতে দেরী হইল না। সকালে মনোময় চিত্তরঞ্জনকে মহারাজ অশোকের জীবনী শোনাইতেছিল। সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট কি ভাবে জীবন যাপন করিতেন, ধর্ম্মের জন্য এবং প্রজাসাধারণের জন্য কত বড় আত্মত্যাগ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই শুনিতে শুনিতে চিত্তরঞ্জন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় বিভারাণী আসিয়া একখানি খামের চিঠি স্বামীর কোলের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

খামখানি খোলা। বিভা নিশ্চয়ই পড়িয়াছে। মহারাজ অশোকের জীবন-কথা শেষ হইতে পাইল না। মনোময় জিজ্ঞাসা করিল, কার চিঠি?

—তোমার দাদার।

—কি লিখেছেন?

বিভা ফিরিয়া আসিল। বলিল, পড়েই দেখ না।

মস্ত বড় চিঠি। পড়িতে অনেক সময় লাগিল। পড়া শেষ করিয়া উদ্বিগ্নমুখে মনোময় বলিল,—তাহ'লে?

বিভা বিরক্তভাবে বলিল, তা আমি কি জানি? তোমাদের সম্পত্তি তোমরা বাঁধা দিলে আমি ঠেকাতে পারি?

মনোময় চিন্তিতভাবে বলিল, সেই জন্যেই তো আমি হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলাম।

সম্পত্তি বাঁধা দেওয়াতেও বিভার আপত্তি ছিল। কিন্তু মনোময়কে লইয়া ততখানি টানাটানি করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। মনোময় শান্ত লোক, সহজে উত্তপ্ত হয় না। কিন্তু একবার উত্তপ্ত হইলেও আর রক্ষা রাখে না। সে যে ক্রমেই ভিতরে-ভিতরে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে তাহা বুঝিতে বিভার বাকী ছিল না।

এবারে সে শান্ত ভাবেই বলিল,—তাতে কি সুবিধে হ'ত?

—আম-বাগানটা যেত না। একবার বাঁধা পড়লে আর কি দাদা ছাড়াতে পারবেন?

মনোময় আবার অশোকের গল্প করিতে লাগিল :—তার পরে আপনার রাজভাণ্ডারের যা-কিছু ছিল,—ধন, রত্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার—

সব প্রজাদের বিলিয়ে দিয়ে শুধু একখানি কাষায় বস্ত্র প'রে মহারাজ অশোক নেমে এলেন ;—হাতে নিলেন শুধু একটি মাত্র আমলকী। রাজ-রাজেশ্বরের ভিখারী-মূর্ত্তি দেখে প্রজারা সবাই এক সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠল,—জয় মহারাজ প্রিয়দর্শীর জয় !

বিভা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল, সবারই যদি সে ক্ষতি সয়, তোমার সইবে না ? বাগান তো তোমার একার নয় ? আর ও বাগান থেকেও তো আমাদের ভারি লাভ হচ্ছে ?

চিত্তরঞ্জন অকস্মাৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দুই হাতে তালি দিয়া বলিল, ঠিক হবে তাহ'লে! যেমন আমাদের না দিয়ে নিজেরা-নিজেরা খায়, তেমনি উপযুক্ত শাস্তি হবে !

প্রথমটা মনোময় ব্যথিত বিস্ময়ে পুত্রের পানে চাহিয়া রহিল। তারপরে সমস্ত ব্যাপারটিকে বালসুলভ চপলতা মনে করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

কহিল, তারপরে তোরা যখন যাবি, তখন কি খাবি ?

হাতের তালু উল্‌টাইয়া বালক বলিল, আমি আর যাবই না। আমি এখানেই বাড়ী ক'রব, গাড়ী ক'রব, চাকরী ক'রব, ব্যস ! কি দুঃখে দেশে যাব ?

প্রথম আঘাতের ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া মনোময় ভাবিল, তাই তো ! চিত্তরঞ্জন কি দুঃখে দেশে যাইবে ! সমস্ত দেশ ও জাতিকে যে সত্য পথের সন্ধান দিবে, সে কি ছোট একটু পরিধির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে পারে ? ভাবিল বটে, কিন্তু মহারাজ প্রিয়দর্শীর গল্প সেদিন আর জমিল না।

বসন্ত-রাত্রির স্মৃতি

সুচরিতার সঙ্গে যে এখানে দেখা হইতে পারে কমলেশ তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। বস্তুত পক্ষে সুচরিতার কথাই সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। দৈব আর কাহাকে বলে! কোথায় কলিকাতা, আর কোথায় রামটেক পাহাড়! দেখা হইল সেইখানে·· সুচরিতার সঙ্গে···পনেরো বৎসর পরে!

চারিদিকে পাহাড়ের বেষ্টনী, মধ্যে একটি ঝিল। পাহাড় আর ঝিলের মধ্যে শুধু এক ফালি লাল রাস্তা আংটির মতো ঝিলটিকে বেষ্টন করিয়া আছে। পাহাড়ের চূড়ায় শ্রীরাম-সীতার মন্দির। নীচে হইতে উঠিবার জন্য চমৎকার সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির দু'ধারে সারি দিয়া অগণিত বানরের দল বসিয়া থাকে।

বৃদ্ধ পিতার পাশে বসিয়া সুচরিতা পরম কৌতুকভরে ইহাদেরই কতকগুলিকে ছোলা খাওয়াইতেছিল। এমন সময় তাহার দৃষ্টি পড়িল, উপর হইতে ইংরাজি পোষাক-পরা একটি ভদ্রলোক ছড়ি দুলাইতে দুলাইতে অত্যন্ত ঢিলাভাবে নীচে নামিয়া আসিতেছে!

কৌতুক বন্ধ করিয়া সুচরিতা শান্তভাবে পিতার পাশে বসিল। বানরগুলা খেলা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ক্ষুণ্ণভাবে পরস্পরের মুখের পানে চাহিতে লাগিল।

অমন দীর্ঘ দেহ এবং গৌরবর্ণ সাধারণ বাঙালীর মধ্যে দেখা যায় না। যে একবার তাহাকে দেখিয়াছে তাহার আর কমলেশকে ভুল করিবার উপায় নাই। অত দূর হইতেও সুচরিতা তাহাকে চিনিতে পারিল।

ঠিক চেনা নয়,—তাহার কেমন মনে হইল, ভদ্রলোক কমলেশ নয় তো? কিন্তু কমলেশ···এখানে?

আরও কাছে আসিলে সুচরিতা নিশ্চয় করিয়া চিনিতে পারিল। সেই কমলেশ! কেবল মুখের ভাবে একটা গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে, সেই সঙ্গে কেমন একটা বিষণ্ণ ছায়াও যেন নামিয়াছে। দেহ একটু স্থূল হইয়াছে, আর মাথায় পড়িয়াছে টাক।

সুচরিতার হাসি আসিল। এই চল্লিশ বছরেই টাক!

সুচরিতা তাহার পিতার গা টিপিয়া মৃদুস্বরে বলিল, কমলেশ নয়?

কমলেশ? মিঃ ঘোষ ভাবিতেছিলেন, তাঁহার ব্যাঙ্কের কথা। এখনও অনেক দূর যাইতে হইবে,—সেই সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত। আরও অনেক টাকার দরকার। সেটা ঠিক কোথায় পাঠাইবার পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে সে এক সমস্যার ব্যাপার। আসল কথা এখান হইতে তিনি বোম্বাই যাইবেন, না জব্বলপুর যাইবেন সেইটাই এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

মেয়ের প্রশ্নে তিনি যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন। বিস্মিত-ভাবে শুধু বলিলেন, কমলেশ?

কিন্তু সুচরিতা এবার আর কোনো উত্তর দিল না। হয়তো পিতার কথা তাহার কাণেও প্রবেশ করে নাই। কমলেশ তখন একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। সুচরিতা তাহার সুমুখে পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া মিটি-মিটি হাসিতে লাগিল।

কমলেশ থমকিয়া দাঁড়াইল। সুচরিতাকে সেও প্রথমে চিনিতে পারিল না। না পারারই বা অপরাধ কি? পনেরো বছর দেখা নাই। এতদিন পরে রামটেকের পাহাড়ে তাহার সঙ্গে দেখা হইবে এ কথা কে ভাবিয়াছিল?

কমলেশ থমকিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সে এক মিনিটও নয়। তারপর শ্লথকণ্ঠে বলিল, মি সে স রা য়!

অতীত দিনের মতো ললিত গ্রীবাভঙ্গী করিয়া সুচরিতা দ্রুত মৃদু কণ্ঠে বলিল, আমি সুচরিতা।

তারপরে বাপের দিকে চাহিয়া সহজভাবে বলিল, তুমি বাবাকে চিনতে পারলে না?

তাড়াতাড়ি মিঃ ঘোষের কাছে গিয়া বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া কমলেশ বলিল, হঠাৎ এদিকে যে! আমি তো···

পাশের একটা জায়গায় হাত দিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ঘোষ বলিলেন, বোসো।

তারপর মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বেরিয়েছি দেশ-ভ্রমণে। ঘুরতে ঘুরতে এইখানে। তারপরে তুমি এদিকে যে!

—আমি তো নাগপুরেই থাকি আজকাল। এ জায়গাটা আমার বড় ভালো লাগে। তাই মাঝে মাঝে আসি। কিন্তু আপনাদের যে দেখতে পাব স্বপ্নেও ভাবি নি।

বলিয়াই সুচরিতার পানে চাহিল। এই পনেরো বছরে সুচরিতা কেবল একটু মোটা হইয়াছে, নহিলে ত্বকের সে মসৃণতা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই,—অমন সুন্দর রঙেও বার্দ্ধক্যের ম্লান ছায়া পড়ে নাই। আর তাহার নিজের?

কমলেশ আপন মনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

মিঃ ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর? এখানে প্র্যাকটিসের অবস্থা কি রকম?

অবস্থা যে ভালো নয় কমলেশ শুধু ঠোঁট উলটাইয়া ঘাড় নাড়িয়া সে কথা জানাইয়া দিল।

—ভালো নয়? দিনে দিনে কি যে হচ্ছে! আর আমাদের কালে ··

সুচরিতা মনে মনে কেন জানি না চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। সে কালের কথা ঘোষ সাহেব একবার তুলিতে পারিলে আর নিস্তার নাই। দীর্ঘ একটানা একঘেয়ে সুরে বৃদ্ধ অনর্গল বকিয়া চলিবেন। সুচরিতা তাহা জানে। তাই সেকালের কথা উঠিতেই সে সশঙ্কিত ভাবে কথাটা ঘুরাইবার জন্য বলিল,

—এইবারে কিন্তু তোমাকে উঠতে হবে বাবা। তোমার 'স্যানাটোজেন' খাওয়ার সময় হ'ল।

বৃদ্ধের উঠিতে ইচ্ছা ছিল না। তবু নিতান্ত ভালোছেলের মতো বলিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবারে ওঠা যাক।

কমলেশের পানে চাহিয়া সুচরিতা বলিল, তুমি কোথায় উঠেছ?

কমলেশ তাহাদের সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিল, একই জায়গায়। এখানে ওই ধরমশালা ছাড়া আর ওঠবার জায়গা নেই।

সুচরিতা উল্লসিত বিস্ময়ে বলিল, বাঃ! এক জায়গায় রয়েছি, অথচ দুজনে দেখা নেই!

কমলেশ হাসিয়া বলিল, না হওয়ারই কথা। আমি এসেছি কাল রাত্রে আর ভোর না হ'তেই বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু তোমরা মন্দির দেখতে যাবে না?

ঘোষ সাহেব কন্যার মতামতের জন্য জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিলেন।

সুচরিতা কহিল, এখন থাক, বাবা। বেলা হয়ে গেছে। বরং বিকেলের দিকে ওঠা যাবে।

সুচরিতা নয়, মিসেস রায়।

তখন সুচরিতা অল্পদিন হইল বিধবা হইয়াছে। নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া সকলেই তাহাকে মিসেস রায় বলিয়াই ডাকিত। এই নামেই কমলেশের সঙ্গে তাহার প্রথম পরিচয়। দেখিতে দেখিতে সেই মিসেস রায় সুচরিতা হইল এবং তাহাদের সমাজে ব্যাপারটা লইয়া বহু প্রকারের সরস গবেষণা চলিতে লাগিল।

সুচরিতার আতিথ্যে কমলেশের দিনটা আজ মন্দ কাটিল না। মধ্যাহ্ন আহারের পর শুইয়া শুইয়া কমলেশ সেই সকল পুরাতন কথাই ভাবিতেছিল।

সেই বসন্তরাত্রির কথা তাহার বেশ মনে পড়ে। পনেরো বছর আগের ঘটনা, কিন্তু আজ কমলেশের মনে হইল সে যেন গত কালের কথা।

কি একটা উপলক্ষে ঘোষ সাহেবের বাড়ীতে পার্টি হইয়াছিল। বাড়ীর সুমুখের প্রশস্ত লনে মজলিস বসিয়াছিল। কমলেশ তখন সবে বিলাত হইতে ফিরিয়াছে। তাহারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। বন্ধুগণের অনুরোধে সেখানে সে এস্‌রাজ বাজাইয়াছিল।

বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রি। সমস্ত লনটি স্বপ্নলোকের মতো নীলাভ

হইয়া উঠিয়াছিল। মাঝে-মাঝে কয়টি ফুল ফুটিয়াছিল—রক্তের মতো টকটকে লাল। কমলেশের এস্‌রাজের সুর যেন সেই লাল ফুল, নীলাভ-কৃষ্ণ বৃক্ষপত্র ছুঁইয়া-ছুঁইয়া অসীম শূন্যে, উর্দ্ধলোকে গলিয়া যাইতেছিল। কখনও তারে-তারে ওঠে ঝঙ্কার,—সে ঝঙ্কার যেন সমুদ্রের তরঙ্গের মতো ফুলিয়া, ফাঁপিয়া, ফেনায়িত হইয়া উত্তাল হইয়া ওঠে। আবার পরমুহূর্ত্তেই অতি মৃদু, করুণ আর্ত্তনাদে মেঘের বর্ণচ্ছটার মতো ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়। উর্দ্ধের স্বর্গলোক সুরের সূতায় ভাসিতে ভাসিতে স্বপ্নালু চোখের সুমুখে নামিয়া আসিল। স্বর্গে মর্ত্ত্যে মিশিয়া সে এক অপূর্ব্ব লোকের সৃষ্টি হইল···

বাদ্য শেষ হইল। সমস্ত লোক, সুমুখের প্রসারিত লন, টকটকে লাল ফুল কয়টি যেন ঘুমঘোরে ঝিমাইতে লাগিল।

সেই রাত্রে সকলে চলিয়া যাওয়ার পর সুচরিতা তাহার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আমাকে আপনি এস্‌রাজ শেখাবেন?

সুচরিতার বড় বড় আয়ত আঁখি,—তাহাতে যেন স্বপ্নের কাজল লাগিয়াছিল। সে চোখে তাহার পঁচিশ বৎসরের জীবনের অভিজ্ঞতার কোনো চিহ্নই ছিল না। এ যেন নিতান্ত অনভিজ্ঞ একটি কিশোরী মেয়ে তাহার কাছে বাজনা শিখিবার আব্‌দার করিতেছে।

তারপরে আরও কত কৌমুদী স্নাত বসন্তরাত্রি আসিয়াছে,—আরও কত বর্ষা রাত্রি, কেয়াগন্ধ-ভারাতুর। দুজনের জীবন ভরিয়া আসিয়াছে কত আনন্দ—কখনও ললিত-ছন্দ-চঞ্চল, কখনও বিরহ-বেদনা-মন্থর।

তারপরে ?

তারপরে ধীরে ধীরে কখন যে আনন্দের ছন্দে তাল কাটিল কেহ জানিতেও পারিল না। পনেরো বছর পরে আজ সকালে আবার দুজনে দেখা।

কমলেশের ঘরের দরজা খোলাই ছিল। সুচরিতা হাসিতে হাসিতে অত্যন্ত সহজভাবে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া অদূরে বসিল।

অকারণে একবার মুখ মুছিয়া বলিল, তারপরে ? শুনি তোমার কথা।

কমলেশ বালিশে ঠেস দিয়া আরও একটু উঁচু হইয়া শুইয়া বলিল, আমার কথা ? আমার তো আর কোনো কথাই নেই সুচরিতা। তুমি যতদূর পর্য্যন্ত জানো, সেই আমার কথা। তারপরে যা ঘটেছে সে কথাও নয়, কাহিনীও নয়, কিছুই নয়।

সুচরিতা আর কমলেশ। কিন্তু কে বলিবে দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা ! এ যেন দুটি নিকট আত্মীয়ে অকস্মাৎ দেখা হইয়াছে,—দেখা হইয়াছে ট্রেনের কামরায়। সময় তো বেশী নাই। তাই তাড়াতাড়ি কুশল প্রশ্ন সারিয়া লইতেছে।

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে তো করেছ ?

—করেছি।

সুচরিতা মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল। বলিল, তারপরে ?

—ছেলেপুলে হয়েছে।

—ক'টি ?

—তিনটি ছেলে, চারটি মেয়ে।

এবারে সুচরিতা জোরে জোরেই হাসিয়া ফেলিল।

কমলেশ অপ্রস্তুত ভাবে হাসিয়া বলিল, হাসছ যে !

—না হাসিনি। আচ্ছা, তোমার সেই ক্যারম খেলার সখ এখনও আছে ?

—আমার ? পাগল ! এই বুড়ো বয়সে···হুঁঃ !

সুচরিতা আর কোন কথা কহিল না। আপন মনে আপনার শাড়ীর প্রান্ত লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

একটু পরে কমলেশ বলিল, তুমি কিন্তু একটুও বদলাও নি সুচরিতা ! ঠিক তেমনি আছ। কেবল একটু স্থূল হযেছ। কিন্তু সে কিছুই নয়।

অপাঙ্গে দৃষ্টি হানিয়া সুচরিতা হাসিয়া বলিল, সত্যি ?

—সত্যি।

—সবাই তাই বলে।—বলিযা সুচরিতা মুখ নীচু করিয়া এক অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কমলেশ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

—সবাই মানে ? অপূর্ব্ব বাবু ?

এবারে সহজ চোখে সুচরিতা সোজা তাহার পানে চাহিল। বলিল, ও অপূর্ব্ববাবু তো পুরোনো লোক। তারপরে যাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে তাঁরাও তাই বলেন।

কমলেশ এক মিনিট তীব্র দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল। কিন্তু

তখনই কি ভাবিয়া আবার ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়িল। বলিল, যাও, এ তোমার সেই পুরোনো কৌশল।

বিস্মিতভাবে স্থচরিতা বলিল, পুরোনো কৌশল!

—হ্যাঁ, পুরোনো কৌশল। মনে নেই, অপূর্ব্ববাবুর কথা ব'লে তুমি কেমন ক'রে আমার হিংসা উদ্রিক্ত করতে? আমি জানতাম, অপূর্ব্ববাবু তোমারও ভালোবাসার যুগ্যি নয়, আমারও হিংসের যুগ্যি নয়। তবু তুমি যখন তোমার স্বভাবসুন্দর নিস্পৃহ-ভাবে তার কথা বলতে, আমি ভাবতাম, তোমার মন বুঝি বাঁধা রয়েছে সেইখানে,—আমার আর কোনো আশাই নেই। অপূর্ব্ব-বাবুর চিন্তা কীটের মতো আমাকে দিবারাত্রি দংশন করত। সে দংশনে জ্বালা যত না ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল অস্বস্তি।

স্থচরিতা হাসিয়া বলিল, আমার কি এ সবই কৌশল?

—আমার তাই মনে হয়।

স্থচরিতা একটুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার হাসি মিলাইয়া গেল। কহিল, কৌশল নয়, ও আমাদের একটা বিলাস। তোমাদের দুঃখ দিতে আমাদের ভালো লাগে, তাই দিই।

স্থচরিতার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া কমলেশ এই কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তারপর কহিল, আচ্ছা, তুমি যে আরও অনেক নতুন বন্ধুর খবর দিলে সে কি সত্যি?

স্থচরিতা ঈষৎ বিরক্ত হইল। তবু সে বিরক্তি যথাসম্ভব গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কেন সত্যি নয় শুনি।

আমার দেহে রূপ আছে, পূজারী আসবে না? অনেক ভক্তই আসে। কেউ বাঞ্ছিত, কেউ বা অবাঞ্ছিত। তা হোক। যে ভগবান এত রূপ দিয়েছেন তাঁরই কৃতজ্ঞতা স্মরণ ক'রে আমি সবাইকে সহ্য করি।

তর্কের উত্তেজনায় কমলেশও ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। বলিল, এত ভক্ত দিনরাত্রি তোমার চারিদিকে গুঞ্জন তুলছে, এতে কি কোনো গ্লানি তুমি বোধ কর না?

—গ্লানি? কিছুমাত্র না। মনে হয়, আমার দেহ যেন দেবতার মন্দির। বহু ভক্ত রোজ এসে পূজা দিয়ে যায়। কিন্তু সে তো আমার ব্যক্তিকে নয়। মানুষের মনে আছে রূপের পিপাসা। আমার দেহের মেঘে যে অনন্ত-রূপের আভা এসে পড়েছে—সকল পূজা, সকল স্তবস্তুতি সেই অসীমের। সহ্য করি সেই জন্য।

কমলেশ ব্যারিষ্টারী করে। মানুষের লোভ, মানুষের পাপ, মানুষের কদর্য্যতা এই লইয়া তাহার কারবার। একটা কথা সুন্দর করিয়া বলিলেই যে ভুলিয়া যাইবে এমন সহজ পাত্র সে নয়।

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া অন্য দিকে চাহিয়া সে শুধু বলিল, চিরদিন তোমার এক রকমেই গেল। আমি ভেবেছিলাম।

তাহার কথাটা লুফিয়া লইয়া তীব্র শ্লেষের সঙ্গে সুচরিতা বলিল, তুমি ভেবেছিলে আমার টাক পড়ে গেছে, গায়ের চামড়া লোল হ'য়ে গেছে, দেহ আর ঋজু নেই, কেমন? কিন্তু তা নয়। আমার চিরদিন এক রকমেই গেল। যেদিন রকম-ফের হবে সেদিন যেন আমার মৃত্যু হয়।

সুমুখের জানালা দিয়া চাহিলেই একটা পাহাড় নজরে পড়ে। দেখিলে মনে হয়, এখান হইতে কয়েক পা গেলেই পাহাড়টা ছোঁয়া যাইবে। কিন্তু কমলেশ জানে পাহাড়টা কাছে নয়, অনেক দূরে।

কমলেশ সেই দিকেই অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া ছিল। সুচরিতার কথায় তাহার চমক ভাঙিল। চকিতে একবার তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখ এবং সুগঠিত দেহশ্রীর পানে চাহিয়া কি যে বলিবে ঠিক করিতে পারিল না।

একটু পরে কমলেশ জিজ্ঞাসা করিল, এখান থেকে তোমরা কোথায় যাবে ?

সুচরিতা হাসিয়া বলিল, সেইটেই এখনও ঠিক করতে পারি নি। চল না, তোমার ওখানেই যাওয়া যাক। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে তো ?

এবারে কমলেশ হাসিয়া বলিল, না।

—কেন বল তো ?

—আমার টাক দেখেই যে ঠাট্টা করলে, তাকে দেখলে তো হেসে গড়িয়ে পড়বে।

বাঁ হাত দিয়া তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া সুচরিতা বলিল, আহা, তোমার বউকে যেন আমি কখনও দেখিনি কি না ?

—দেখেছ ?

—দেখব না কেন ? আমাদের কলেজেই তো পড়তো। খুব ভালো নাচতে পারতো। কেমন কি না ?

অলসভাবে বিছানায় আবার শুইয়া পড়িয়া কমলেশ বলিল, তা

জানিনে, নাচ কখনও দেখিনি। কিন্তু তখন কি ভুঁড়ি ছিল?

সুচরিতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, ভুঁড়ি!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভুঁড়ি। উদর প্রদেশের স্ফীতি। ছিল?

—ভুঁড়ি হ'য়েছে না কি?

কমলেশ গম্ভীরভাবে কহিল, হয়েছে। আর দেহের ওজন দাঁড়িয়েছে দু'মণ পনেরো সের।

হাসিতে হাসিতে সুচরিতার মাথা কমলেশের বুকের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

—ভুঁড়ি কি গো?

কমলেশ শুধু একটু হাসিল, এবং অতি সন্তর্পণে সুচরিতার মাথার উপর দক্ষিণ করতল রাখিল। সুচরিতা তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া বলিল, তোমার জন্যে বড় দুঃখ হয়।

—দুঃখ? দুঃখ কেন?

সুচরিতা উত্তর দিল না, শুধু অবনত মুখে অপাঙ্গে একবার চাহিল।

কমলেশ একটু হাসিয়া বলিল, দুঃখ আমার কিছুই নেই সুচরিতা। একদিন আমারও রূপের সবাই প্রশংসা করত। সেদিন এই দেহের সেবাও কম করি নি। আজকে আমার টাকের উল্লেখ করলে কিছু দুঃখ হয় না। দুঃখ হয়, কেউ যদি বলে আইনে আমার জ্ঞান নেই।

—কিন্তু আইনের চর্চ্চা করেই তো একটা লোকের দিনরাত্রি কাটতে পারে না।

—তা পারে না। কিন্তু আমি তো শুধুই ব্যারিষ্টারী করি না। বড় ছেলে-মেয়ে দুটোর পড়া দেখি মাঝে-মাঝে। ছোটগুলির সঙ্গে খেলা আছে···কিন্তু এ সব তুমি বুঝবেনা সুচরিতা। আমার দিনরাত্রি কাজে আর অবকাশে ভরাট হয়ে আছে। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই।

কিন্তু এ সকল কথায় সুচরিতা কোনো আগ্রহ অনুভব করিল না। সে বলিল, পনেরো বছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা। একটা অনুরোধ করলে শুনবে ?

—কি অনুরোধ শুনি।

তাহার হাতের উপর একটু চাপ দিয়া বলিল, তোমার এস্‌রাজ শুনতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। শোনাবে? আনব আমার এস্‌রাজটা ?

এস্‌রাজের কথা শুনিয়া কমলেশ ম্লানভাবে একটু হাসিল। বলিল, এস্‌রাজ তো আর আমি বাজাই না সুচরিতা। আর পারিও না, হাত ভারী হ'য়ে গিয়েছে।

বিস্ময়ে সুচরিতার প্রথমটা মুখে কথা জোগাইল না। এস্‌রাজ বাজায় না! কিন্তু তখনই কথাটা পরিহাস ভাবিয়া হাসিয়া উঠিল। উঠিতে উঠিতে বলিল,—

—আচ্ছা, দেখিতো কেমন হাত ভারী হয়ে গিয়েছে!

সুচরিতার ও-ঘ'র হইতে এস্‌রাজ আনিতে তিন মিনিটের বেশী লাগিল না। কমলেশের দেওয়া সেই এস্‌রাজটি,—হাতির দাঁতের কাজ করা। একটি কোণে সোনার উপর মীনায় দুজনের নামের আদ্যাক্ষর পাশাপাশি বসানো। সুচরিতা এস্‌রাজটি তাহার হাতে

তুলিয়া দিল। কমলেশ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই হু'টি অক্ষর বারে বারে দেখিতে লাগিল।

—বাজাও।

কমলেশ তাহার হাতে এস্‌রাজটি ফিরাইয়া দিল। মনে হইল, যেন তাহার চোখ ছলছল করিতেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তোমাকে আমি মিথ্যে বলি নি, সুচরিতা। আমার হাত ভারী হ'য়ে গেছে,—ছড় টানতে হাত কাঁপে। সে আর তুমি নিজের চোখে নাই দেখলে। বরং তুমি একটু বাজাও, আমি শুনি।

সুচরিতা বাজাইতে লাগিল। সুচরিতার হাত আরও চমৎকার খুলিয়াছে। সে কমলেশের পাশে বসিয়া তাহারই সেখানো একটি গৎ তাহারই মতো সুন্দর করিয়া বাজাইতে লাগিল। চোখ বন্ধ করিয়া কমলেশ গৎ শোনে আর তাহার নিমীলিত চোখের কোণ বহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়ে।

বাজনা শেষ করিয়া সুচরিতা তাহার পানে চাহিল।

কমলেশ শুধু বলিল, চমৎকার।

সুচরিতা আস্তে আস্তে সরিয়া আসিয়া কমলেশের বুকের উপর মাথা রাখিল। বলিল, তুমি যতই বল, তোমার জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হচ্ছে। মনে হচ্ছে···

সুচরিতা একটু থামিল। কহিল, মনে হচ্ছে, তুমি যেন আত্মহত্যা করেছ।

দক্ষিণের জানালা দিয়া এক ঝলক হাওয়া আসিয়া সুচরিতার মাথার স্বল্প গুণ্ঠন স্থানচ্যুত করিয়া দিল। তাহার কুঞ্চিত

কেশদামের মধ্যে কমলেশ অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে লাগিল। এবার আর সে কোনো প্রতিবাদ করিল না।

অকস্মাৎ তাহার নজরে পড়িল…

নজরে পড়িল একগাছি পাকা চুল!

কমলেশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। কহিল, একি! তোমার মাথায় পাকা চুল!

সুচরিতা যেন জ্যামুক্ত ধনুকের মতো ছিট্‌কাইয়া দূরে চলিয়া গেল।

—পাকা চুল! তুমি কি পাগল হয়েছ! পাকা চুল আবার কোথায় দেখলে। পাগল আর কি!

সুচরিতা ঝড়ের মতো বাহির হইয়া গেল।

কমলেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। কিন্তু সুচরিতা আর ফিরিয়া আসিল না।

কমলেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিল।

তাহার কোলের কাছে এস্‌রাজখানি পড়িয়া আছে।

কৃতজ্ঞতার বিড়ম্বনা

পরের শনিবার সুহৃৎ বাড়ী ফিরে এল। গৃহিণীর টুকিটাকি বরাতি জিনিসগুলি বুঝিয়ে দিয়ে আহারের সময় জিজ্ঞাসা করলে আর কামারদের সেই কাণ্ডটার কি হ'ল বল ত? মিটে গেছে?

গৃহিণী চুমকুড়ি কেটে বললেন মেটবার জ্বালা! দিনরাত্রি হৈ হৈ হচ্ছে। পঞ্চু কামার তো নালিশ ক'রে এসেছে।

—বল কি? পঞ্চু কামারের সাহস এত বেড়েছে?

—সাহস আর বাড়বে না কেন? মুখুয্যেদের ছোট তরফ যে তলে তলে উস্কে দিচ্ছে। নইলে···

সুহৃৎ ব্যাপারটা বুঝলে। মাথা নেড়ে বললে হুঁ। তাই ত বলি, পঞ্চু কামার···

গৃহিণী ফিস্-ফিস্ ক'রে বললেন টাকাও নাকি ছোট তরফই দিচ্ছে। আমার বাপু শোনা-কথা, সত্যি মিথ্যে জানি না। ও-সব কথায় আমি থাকিও না, থাকতে ভালও লাগে না। আমি বলে নিজের ঝঞ্ঝাট নিয়েই ব্যস্ত।

একটু থেমে সুহৃৎ বললে, বড় তরফকে তখনই বললাম, পঞ্চুকে কিছু দিয়ে মিটমাট ক'রে নিতে। কাজটা ত আর সত্যিই ভাল হয় নি। তবে রাগের মাথায় হ'য়ে গেছে এই যা। বলে, রাগ না চণ্ডাল।

গৃহিণী আবার ফিস্-ফিস্ ক'রে বললেন, বড় তরফ ত মিটমাট করতে চেয়েছিল, ছোট তরফ দিলে কই! নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পাইকের সঙ্গে দিলে ডুলি ক'রে সদরে পাঠিয়ে।

সুহৃৎ মাথা নেড়ে বললে সে-বারের দ'য়ের মাছ ধরার শোধ নিলে আর কি। ছোট তরফ তক্কে-তক্কেই ছিল কি না।

তবে আর বলেছে কেন, ভায়াদ বড় শত্রু। আর কেউ হ'লে পারত ?

—পঞ্চুকে একেবারে চোখে-চোখে রেখেছে। পাছে বড় তরফ টাকাকড়ি দিয়ে মিটিয়ে ফেলে। ব'লে বেড়াচ্ছে, বড়বাবুকে জেল দিয়ে তবে অন্য কাজ।

—কাকে কাকে আসামী করেছে ?

—শুনছি তো বড়বাবুকে আর হারাধন পাইককে। সত্যি-মিথ্যে জানি নে বাপু।

সুহৃৎ চিন্তিত মুখে বললে, হুঁ।

গৃহিণী স্বামীর পাতে আর একটু মাছের তরকারী দিয়ে বললে, আবার বলছে তোমাকেও নাকি সাক্ষী মেনেছে।

এই আশঙ্কাই সুহৃৎ করছিল। ভাতের গ্রাস তার হাত থেকে প'ড়ে গেল। বিস্মিত ভাবে বললে, আমাকে ?

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, বলছে তো তাই। মুখপোড়ারা সব পারে। তোমার বাপু ওখানে যাওয়ার দরকার কি ছিল ?

সুহৃৎ খবরটা শুনে বিলক্ষণ দমে গেল। নিস্তেজভাবে বললে, ইচ্ছে ক'রে কি আর গিয়েছিলাম, আমি যে ওইখানেই ছিলাম। নিখিলের সঙ্গে যখন গল্প করছি তখনও কি জানি, পঞ্চুকে ধ'রে আনতে পাইক গেছে ? নিখিলের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল বটে, কেমন যেন অন্যমনস্ক। কিন্তু এত কাণ্ড হবে তা ভাবি নি। তা হ'লে তো তখনই মিটিয়ে দিতাম। আমি না থাকলে তো পঞ্চুর শেষই হয়ে গিয়েছিল। হারাধনটা তো কম দুষমন নয়।

—বেশ করেছিলে। এখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে সদর আর ঘর কর।

ঢক্ ঢক্ ক'রে খানিকটা জল খেয়ে সুহৃৎ বললে, হ্যাঁ। সাক্ষী দেবার জন্যে আমি কাঁদছি কি না! নিখিলের বিরুদ্ধে আমি দোব সাক্ষী! ওদের কি মাথা খারাপ হয়েছে তাই আমাকে মেনেছে সাক্ষী? সাক্ষী দোব! আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই!

—তা ওরা যদি মানে? কোর্টে দাঁড়িয়ে তুমি মিথ্যে কথা বলবে?

উত্তেজিত ভাবে সুহৃৎ বললে, দরকার হ'লে তাও বলব, তবু নিখিলকে বিপদে ফেলতে পারব না। মনে নেই, ওর ভগ্নীপতি এই চাকরিটা না ক'রে দিলে আজ কোথায় দাঁড়াতাম? আজ জমি করেছি, জায়গা করেছি, পুকুর বাগান কিনেছি, গ্রামের পাঁচ জনের এক জন হয়েছি। কিন্তু সে-দিনের কথা মনে ক'রে দেখ দিকি! সে ভদ্রলোক সাহায্য না করলে এমন চাকরী পেতাম? তখন আমি কলকাতায় জানতামই বা কি, আর চিনতামই বা কি! আমার শরীরে কি মানুষের রক্ত নেই, যে যাব নিখিলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে?

নিখিলের ভগ্নীপতির উপকারের কথা সুহৃৎ কিছুতে ভুলতে পারে না। সে অনেক দিনের কথা। সুহৃৎ তখন সবে এণ্ট্রান্স পাস করেছে। সেই বছরই তার বিয়ে হয়েছে। তার বাপের যা সাংসারিক অবস্থা তাতে মোটা ভাত-কাপড়টা কোনো রকমে চ'লে যায়। কিন্তু সেইবারই হ'ল অজন্মা। জমির ধান বিক্রী ক'রে যাদের সংসারের সব খরচ চালাতে হয় তারা পড়ল বিপদে।

এই বিপদে প'ড়ে সুহৃৎদের এমন অবস্থা হ'ল যে, দিন আর চলে না। তার বাপের শরীর নানা দুশ্চিন্তায় ক্রমেই শুকিয়ে যেতে লাগল। মেজাজ খিটখিটে হ'ল। কথায় কথায় সুহৃদের অপমানের আর সীমা থাকে না। এই প্রকার দুঃসময়ে বিধাতার বরের মত এলেন নিখিলের ভগ্নীপতি। কিন্তু বহুপ্রকারে তাঁর খোশামোদ ক'রেও সুহৃদের বাবা পাত্তা পেলেন না। তিনি সোজা জবাব দিলেন, চাকরী খালি নেই। অবশেষে সুহৃদের মা গিয়ে ধরলেন একসঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও শাশুড়ীকে। তাঁদের অনুরোধ ঠেলতে না পেরে অবশেষে তিনি সুহৃৎকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি হলেন। কিন্তু সুহৃদের তখন এমন অবস্থা যে ট্রেন-ভাড়াটি পর্য্যন্ত নেই। যাওয়া আর হয় না। শেষে ভদ্রলোক নিজেই ট্রেনভাড়া দিয়ে তাকে নিয়ে যান, এক মাস নিজের বাসায় রেখে এই চাকরীটি জুটিয়ে দেন। এই কথা সুহৃৎ কোনো দিন ভোলে নি। নিখিল তার বন্ধুও নয়, সমবয়সীও নয়। কোন রকম আত্মীয়তাও নেই। তবু কলকাতা থেকে বাড়ী এসে একবার অন্তত তার ওখানে গিয়ে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই চাই। তাদের বাড়ীর কারও অসুখ-বিসুখের খবর কাক-মুখে শুনলেও দুটো ফল নিয়ে আসে। দুটো কপি বাড়ী আনলে তার একটা ওদের বাড়ী দেয় পাঠিয়ে। তার কৃতজ্ঞতায় ওরা অবশ্যই খুশী হয়, এবং প্রজার কাছ থেকে যে-ভাবে নজর নেয় সেইভাবেই কৃতজ্ঞতার উপহারও খুশী মনে গ্রহণ করে। দরকার পড়লে কখনও কখনও দু-চারটে জিনিস ফরমাসও করে। দিতে গেলেও সুহৃৎ দাম নেয় না। হেসে বলে, বিলক্ষণ! তোমার কাছ থেকেও দাম নেব? খাচ্ছি কার?

এমনি ক'রে এক পক্ষের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও সুহৃৎ তার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার একটা যোগসূত্র রেখেই চলেছে। সে শুধু অবাক হ'ল এই ভেবে যে, নিখিলের বিরুদ্ধে সে সাক্ষ্য দিতে পারে এমন কথা লোকে ভাবলে কি ক'রে? নিখিলদের কাছে তার কৃতজ্ঞতার ঋণের কথা গ্রামের কোন লোকটা না জানে?

সুহৃৎ আপন মনেই হাসলে, হুঃ!

গৃহিণী বললেন, তুমি বাপু ওসবের মধ্যে থেক না। পরের নেঞ্জার নিয়ে চাকরি খোয়ালে তো চলবে না!

সুহৃৎ উঠ্‌তে উঠ্‌তে বললে, পাগল!

ব্যাপারটা এই প্রকার:

নিখিলের বড় মেয়েটি অনেক দিন পরে সম্প্রতি শ্বশুরালয় থেকে এসেছে। পাড়ার আর ক'টি সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে সে চলেছিল ও-পাড়ায় এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে। পঞ্চু কামারের বাড়ীর পেছন দিয়ে যে সরু পথ জঙ্গলের মাঝ দিয়ে গেছে মেয়েদের এ-পাড়া-ও-পাড়া করার পক্ষে সেইটিই সুবিধাজনক। সেই রাস্তার ধারে পঞ্চুর পাঁচিল-লাগাও যে আমগাছটা, এবারে সেটায় অজস্র আম হয়েছে। দেখে নিখিলের মেয়ের লোভ হয়। ঢিল ছুঁড়ে গোটাকতক আম সে পাড়ে। গাছটা কামারদের। ঢিল ছোঁড়ার শব্দ পেয়েই পঞ্চুর স্ত্রী নেপথ্যে থেকেই তাদের কতকগুলি শ্রুতিকটু সম্বোধন করে। নিখিল এ গ্রামের দশ আনার

জমিদার। তার মেয়ে ভাবে, তার গলার সাড়া পেলে পঞ্চুর স্ত্রী নিশ্চয় থামবে। এই ভেবে সে বলে, আমি গো কামার-খুড়ী! তোমার গাছের একটা আম পাড়লাম।

কিন্তু কামার-খুড়ী সহজে বিগলিত হবার মত মেয়েই নয়। সে নেপথ্য থেকেই মুখ ভেংচে বলে, তবে আর কি। কামার-খুড়ী সগ্‌গে গেছে! মুখপুড়ীদের মরবার জায়গাও নেই!

নিখিলের মেয়ে স্নেহ-সম্ভাষণের উত্তরে এই কটূক্তি পেয়ে বিরক্ত হয়। বলে, আ মোলো। এ মাগী তো ভারি দজ্জাল দেখছি।

আর যাবে কোথায়! কামার-খুড়ী বেরিয়ে এসে এমন গালাগালি দিতে লাগল সে গাল কাণে শোনা যায় না। এ গ্রামে সে একটা ডাকসাইটে মেয়ে। তিন দিন ধরে অনর্গল গাল দিয়ে যেতে পারে। দম নেবার জন্যেও এক মিনিট থামবে না। তার মুখের তোড়ে ওরা দাঁড়াতে পারে? ওরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে বাঁচল। আর কামার-খুড়ী দু-ঘণ্টা ধ'রে সেইখানে দাঁড়িয়ে ওদের ঊর্দ্ধতন এবং অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষকে নরকের বিভিন্ন স্থানে পাঠাতে পাঠাতে পাড়া মাথায় তুললে।

নিখিল কি একটা কর্ম্মোপলক্ষে বাইরে গিয়েছিল। রাত বারোটার সময় ফিরে এসে সমস্ত শুনে রাগে গুম হ'য়ে ব'সে রইল, মুখে কিছু বললে না। সকালে উঠেই হারাধনকে হুকুম দিলে, পঞ্চু কামারকে যেখানে পাস সেখান থেকে ধ'রে নিয়ে আয়।

হারাধনও তাই চায়। বিছানা থেকে আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় পঞ্চুকে সে তুলে নিয়ে এসে কাছারীতে ফেললে। তার পর একটা

থামে বেঁধে চাবুক দিয়ে প্রহার আরম্ভ করলে। সে প্রহার এমনই অমানুষিক যে, সুহৃৎ ঠিকই বলেছে, সে না থাকলে পঞ্চু খুন হ'য়ে যেত।

ভেবে দেখতে গেলে পঞ্চু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। জমিদারের মেয়েকে সে নিজে গালাগালি দেয় নি, স্ত্রীকেও গালাগালি দেওয়ার জন্যে উৎসাহিত করে নি। বস্তুত পক্ষে এ-ব্যাপারের কিছুই সে জানত না। সেও পেটের ধান্ধায় বাইরে কোথায় গিয়েছিল। রাত্রে ফিরে এসে দুটি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে। তার স্ত্রীও ব্যাপারটাকে তার নিত্যকর্ম্মের ভগ্নাংশ হিসাবে মেনে নিয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় নি। স্বামীকেও জানানোর প্রয়োজন মনে করে নি। পঞ্চু যখন প্রহার-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করছে তখনও পর্য্যন্ত জানে না, কেন এ শাস্তি।

তা সে জানুক আর না জানুক, পৃথিবীতে এ রকম ঘটনা কিছু বিরল নয়। স্বামীর অপরাধে স্ত্রীর কিংবা স্ত্রীর অপরাধে স্বামীর, পিতার অপরাধে পুত্রের কিংবা পুত্রের অপরাধে পিতার লাঞ্ছনা অহরহ দেখা যায়। বরং এইটিই প্রথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সে কথা যাক্।

আর পাঁচজন দুর্ব্বল লোকের মত পঞ্চুও এ অপমান নীরবেই সহ্য করত। কিন্তু করতে দিলে না ছোট তরফের অখিল বাবু। উৎপীড়িতের প্রতি প্রীতিবশে নয়, কিছুকাল আগে দহের দখল নিয়ে নিখিলের কাছে যে লাঞ্ছনা ভোগ করেছিল, পঞ্চুকে অবলম্বন ক'রে সেই অপমানের সে প্রতিশোধ নিতে চায়। পঞ্চুকে দিয়ে অখিল মামলা দায়ের করালে। কিন্তু বিপদ হয়েছে একটাও তার

সাক্ষী নেই। হারাধন পঞ্চুকে পিছনের জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসে। কেউ দেখেছে, কেউ দেখে নি। যারা দেখেছে নিখিলের ভয়ে হোক, খাতিরে হোক, তারা চুপ ক'রে আছে। একমাত্র লোক যার এই ঘটনা দেখা অস্বীকার করার উপায় নেই সে সুহৃৎ। অখিল অবশ্য কতকগুলো মিথ্যে সাক্ষী জোগাড় করেছে (পাড়াগাঁয়ে মিথ্যে সাক্ষী জোগাড় করা সব চেয়ে সহজ) কিন্তু তাদের ওপর ততখানি ভরসা করা যায় না। এরা পেশাদার ধুরন্ধর সাক্ষী হলেও ভালো উকিলের জেরার মুখে নাও টিকতে পারে। সেজন্যে অখিলের চোখ পড়েছে সুহৃদের ওপর। তাকে যদি পাওয়া যায় সে যত টাকা লাগে খরচা করতে প্রস্তুত।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে পঞ্চু সকালবেলায় সুহৃদের সঙ্গে দেখা করতে এল। ভক্তিভরে সুহৃদের পায়ের ধুলো নিয়ে লোকটা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল। তার গায়ের ক্ষত স্থানে স্থানে মিলিয়ে আসছে। কয়েক জায়গায় তখনও দগ্‌দগ্‌ করছে। দেখে সুহৃদের দয়া হ'ল। বললে, বোস্‌ পঞ্চু।

পঞ্চু বসলে বটে, কিন্তু কান্না থামালে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তাকে কি ব'লে সান্ত্বনা দেবে ভেবে না পেয়ে সুহৃৎ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে পঞ্চু বললে, আমি তো খুনই হয়েছিলাম দাদাঠাকুর। আপনি না থাকলে জীবনই যেত।

পঞ্চু কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছলে।

সুহৃৎ শান্তকণ্ঠে বললে, সবই অদৃষ্ট পঞ্চু। যা হয়ে গিয়েছে, হয়ে গিয়েছে। ও নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি ক'রো না।

পঞ্চু তথাপি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সুহৃৎ আবার বললে, বরং কিছু টাকা নিয়ে মিটিয়ে ফেল। হাজার হোক, গ্রামের জমিদার। রাগের মাথায় যদি একটা অন্যায় ক'রেই থাকে, তাই ব'লে তার মুখ হাসাতে হবে?

পঞ্চু তথাপি চুপ ক'রে রইল।

সুহৃৎ বললে, সে না দেয়, আমি দোব। বুঝেছ পঞ্চু? গ্রামের জমিদার তো বটে! দোষ-ত্রুটি সবারই হয়। আবার কাল তুমি বিপদে পড়লে, ওই সব চেয়ে আগে ছুটে আসবে। বুঝলে না? মিটিয়ে ফেল।

পঞ্চুর মুখ দেখে মনে হ'ল, সে যেন একটু নরম হয়েছে। উৎসাহিত হয়ে সুহৃৎ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু পঞ্চু করজোড়ে বললে—আজ্ঞে সে পথ আর নেই দাদাঠাকুর, ভেতরে ভেতরে অনেক কাণ্ড হয়েছে।

বাধা দিয়ে সুহৃৎ বললে, কিছু কাণ্ড হয় নি পঞ্চু। আমি বলছি, মিটিয়ে ফেললে তোমার ভালই হবে।

পঞ্চু কীর্ত্তনীয়ার ঢঙে একটা হাঁটু গেড়ে ব'সে বললে, আপনি বি-দ্যাশে থাকেন দাদাঠাকুর, খপর তো রাখেন না। এর মধ্যে অনেক গুড়-মধু আছে।

পঞ্চু টিপে টিপে হাসতে লাগল। সুহৃৎ বুঝলে, পঞ্চু মামলার রস পেয়েছে। ওকে ঘোরানো শক্ত। সুহৃৎ কিছু বিরক্ত এবং কিছু উৎসুক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

গলা খাটো ক'রে পঞ্চু বললে (যেন সুহৃৎকে অভয় দেবার জন্যে)—এর মধ্যে ছোটবাবু আছে দাদাঠাকুর। দু-হাতে টাকা

খরচ করছে। আমার হাসপাতালের সব খরচ উনিই দিয়েছেন। এখান থেকে গাড়ী ক'রে গেলাম এলাম, সব ওঁর খরচ।—পঞ্চু হেসে বললে, মায় একজোড়া চটিজুতো।

দেখা গেল পঞ্চু বেশ আছে। প্রহারের ক্ষত বাইরে এখনও শুকোয় নি বটে, কিন্তু ভেতরে তার চিহ্ন মাত্র নাই। গ্রামের সকল কথার কেন্দ্র এখন সে। যারা তার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলত না, তারাও এখন তাকে ডেকে বসিয়ে তামাক খাওয়ায়, পাঁচটা কথা জিজ্ঞাসা করে। ঘন ঘন ছোটবাবুর সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে তার চাল পর্য্যন্ত বদলে গেছে।

সুহৃৎ একটু বিরক্ত ভাবেই বললে, তবে মর। ছোটবাবুর চালে পড়েছ, কিন্তু কাল ওদের ভায়ে ভায়ে ভাব হয়ে যাবে। তখন মরতে মরবে তুমি।

পঞ্চু বুঝলে সে কথায় কথায় ভুল পথে চলেছে। সে চুপ ক'রে রইল। ধীরে ধীরে তার চোখে আবার জল জমতে লাগল। সে জল তার লোল গণ্ড বেয়ে টপ্ টপ্ ক'রে নীচে পড়তে লাগল। জলভরা চোখ তুলে বললে, আমি গরীব ব'লেই কি বাবু, আমাকে এত অত্যাচার সইতে হবে? কোনো ভদ্রলোক সাহায্য করবে না? আপনি ত নিজের চোখেই সব দেখলেন দাদাঠাকুর?

কিন্তু এবারে আর ওর চোখের জলে সুহৃৎ গললো না। রুক্ষ কণ্ঠে বললে আমি নিজের চোখে কিছুই দেখি নি পঞ্চু। আমাকে এর মধ্যে টানলে তোমার লাভ হবে না।

সুহৃৎ গট্ গট্ ক'রে বাড়ীর ভেতর চ'লে গেল। ওর দিকে আর ফিরেও চাইল না।

একটু পরে নাপিত এল। রাখু পরামাণিক।

বাৎসরিক বন্দোবস্তের নাপিত। শনিবারে সুহৃৎ আসে। সেজন্যে রবিবার এসে কামিয়ে দিয়ে যায়। এ-কথা-সেকথার পর রাখু বললে গাঁয়ে ত হুলুস্থুল প'ড়ে গেছে দাদাঠাকুর।

—কি রকম ?

—পঞ্চু কামারকে নিয়ে। ভয় আমাদেরই দাদাঠাকুর। ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই লাগে নল-বাগড়ার প্রাণ যায়।

—তোমাদের আবার ভয় কি ?

সুহৃদের দাড়িতে জল বুলোতে বুলোতে রাখু বললে—ভয় বইকি দাদাঠাকুর। এখনই ত বড়বাবু বলছেন, আগুন ছুটিয়ে ছাড়ব। খড়ের ঘরে বাস করি দাদাঠাকুর, রাত-বিরিতে কার ঘরে আগুন লাগবে আর তাদের জন্যে আমরা সুদ্ধ পুড়ে মরব।

সুহৃৎ উপেক্ষার সঙ্গে বললে, ও এমনি ভয় দেখাচ্ছে।

রাখু একটু থমকে কি ভেবে বললে, তা হবে।

তার পর একটু মুচকি হেসে বললে, আপনাকেও তো সাক্ষী মেনেছে শুনলাম। ব'লে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে। কিন্তু সুহৃৎ নিরাসক্ত ভাবে শুধু বললে, হুঁ।

—আজ সকালে পঞ্চু এসেছিল বুঝি আপনার কাছে।

সুহৃৎ তেমনি ভাবে আবার বললে, হুঁ।

কিন্তু রাখু তথাপি দমলে না। বললে, আপনি দেবেন সাক্ষী ? হুঁঃ! বড়বাবু সে দিন বলছিলেন, সুহৃৎ দেবে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী ? সে খাচ্ছে কার ? আমাদের দয়াতেই না সে মানুষের মতো হয়েছে ?

সুহৃৎ যেন চমকে উঠল। কিন্তু তখনই শান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, নিখিল নিজে বলছিল?

—বলবেন বইকি? তাঁর ভগ্নীপতির দৌলতেই আপনার কাজটা হয়েছে কি না, সেই কথা আর কি!

সুহৃৎ শুধু বললে, হুঁ।

রাখু আপন মনেই বলতে লাগল, আমি বললাম, বড়বাবু, তিনি কখ্খনো আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবেন না। বাড়ীতে দুটো কমলালেবু আনলে একটা আপনার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। তিনি তেমন লোকই নন। বড়বাবুও বললেন, হাঁ, সে আমাদের খুব অনুগত।

সুহৃদের চোখের দৃষ্টি আর একবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু সে মুখে কিছু বললে না।

সুমুখ দিয়ে বড় তরফের গোমস্তা নকড়ি ঘোষ যাচ্ছিল। নকড়ি বেঁটে মোটা কালো। মাথায় একসঙ্গে টাক এবং টিকি। মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। গায়ে একটা আধময়লা লংক্লথের পিরাণ। গলায় সরু তুলসীর মালা। নাকে রসকলি। পায়ে তালতলার চটি। বগলে ছাতি।

সুহৃৎকে বৈঠকখানায় দেখে রাস্তা থেকেই দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে নকড়ি প্রণাম জানালে। কাছে এগিয়ে এসে বললে, এই যে! কাল রাত্রে এসেছেন বুঝি? বড়বাবু বলছিলেন···

সুহৃৎ মুখ না ফিরিয়েই বললে, ওটা নিখিল মিটিয়ে নিলেই পারত। মিছিমিছি খানিকটা কেলেঙ্কারী বাধানো।

নকড়ি একটা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উপরের সিঁড়িতে একটা পা রেখে বললে, আজ্ঞে প্রথমে হ'লে মিট্‌তো। এখন দু-পক্ষেরই

জেদ চেপে গিয়েছে। এস্‌পার-ওস্‌পার না হ'লে আর মিটবে না। আপনি বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করেছেন তো ?

প্রতিবার শনিবারে বাড়ী এসে রবিবার সকালেই সুহৃদের সর্ব্বপ্রথম নিখিলের ওখানে কিছু-না-কিছু নিয়ে যাওয়াই চাই। কিন্তু তার অর্থ যে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করা, এমন কথা সে কোনো দিন ভাবে নি। নিখিলকে সে চিরদিন, অর্থাৎ তার ভগ্নীপতির দৌলতে চাকরি পাওয়ার পর থেকে, আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য ক'রে এসেছে। উপকৃত যে-ভাবে উপকারী বন্ধু বা আত্মীয়কে স্নেহ করে তার মনে তেমনি একটা ভাব ছিল। কিন্তু নিখিল যে আবার এই গ্রামের দশ আনার জমিদার, সে যে বড়বাবু, এ-কথা তার কোনো দিন মনেই হয় নি। নকড়ি বড়বাবুর কর্ম্মচারী ব'লেই হোক, অথবা তার বড়বাবুর কাছে যাওয়াটা সে ওই চোখে দেখে ব'লেই হোক, তার মুখে দেখা করার কথাটা সুহৃদের কাণে বিশ্রী ঠেকল।

সে একটু রূঢ়কণ্ঠে বললে, দেখি যদি সময় পাই। নিখিলকে ব'লো যদি দু-পাঁচ টাকা দিয়েও মিটমাট হয় সেই ভাল।

নকড়ি চলে যাচ্ছিল। সুহৃদের কথা শুনে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে —বলেন কি মশাই, টাকা দিয়ে মিটমাট! আমার তো বোধ হয়, পঞ্চা যদি সদরের সমস্ত উঠোনটা নাকখৎ দিয়ে মাফ চায় তাহ'লেও বড়বাবু আর মেটাতে রাজী হবে না। একটা সামান্য প্রজা কোর্টে গিয়ে জমিদারের নামে ফৌজদারী ক'রে আসে এ কি সোজা ব্যাপার না কি ? তার ওপরে আপনি বলেন টাকা দিয়ে মিটমাট করতে ? বেশ !—

ব'লে নকড়ি ঘোষ উপেক্ষার সঙ্গে হাসলে।

সে হাসি দেখে সুহৃদের আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। বললে, তাহ'লে কি করতে চাও শুনি?

দু-পা এগিয়ে এসে বললে—শুনবেন? তাহ'লে প্রথম পর্ব্বটাই শুনুন। যারা যারা সাক্ষী আছে তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া।

নকড়ি বড় বড় দাঁত বের ক'রে হা হা ক'রে হাসলে।

তার কথা শুনে সুহৃৎ ভিতরে-ভিতরে শিউরে উঠল। মুখে নীরস কণ্ঠে বললে, বল কি হে! আমিও তো শুনেছি সাক্ষী আছি। তাহ'লে আমার ঘর থেকেই বউনি হোক।

নকড়ি হা হা ক'রে হেসে বললে, হ্যাঁ, সাক্ষী ভাল বটে।

কিন্তু তখনই গম্ভীর ভাবে বললে, কথাটা আপনি ঠাট্টা ক'রে বললেন বটে, কিন্তু এরই মধ্যে বেটারা বাবুর কাছে আপনার নামে সাতখানা ক'রে লাগাতেও ছাড়ে নি। তা বাবুর অবশ্য আপনার ওপর বিশ্বাস আছে। কারও কথা তিনি কাণেও তোলেন না।

নকড়ি ঘোষের কথা-বলার ভঙ্গীতে সুহৃৎ অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। সে কি ভাবে, সুহৃৎ তারই মত বাবুর কর্ম্মচারী যে তার ওপর বিশ্বাস আছে শুনে কৃতার্থ হয়ে যাবে? জমিদার হ'লেও নিখিল তার বয়ঃকনিষ্ঠ এবং স্বজাতি। তার পরম স্নেহভাজন। সেও কি সুহৃৎ সম্বন্ধে এইভাবে ভাবে না কি?

কিন্তু সুহৃদের মনের কথা নকড়ি টের পেল না। ছাতিটা বাঁ বগল থেকে ডান বগলে নিয়ে সে বলতে লাগল, এই কালই তো কথা হচ্ছিল। বাবু বললেন, যে যা বলে বলুক নকড়ি, সুহৃৎ সম্বন্ধে

আমার বিশ্বাস আছে। সে আমার মোটা প্রজা। আর বড় অনুগত লোক। বাড়ী এলে আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে যায় না। তাও দেখেছ; কোনো দিন শুধু হাতে এল? সে কথনও আমার বিরুদ্ধে যেতে পারে? বলতে গেলে আমাদের খেয়েই মানুষ। না, না, নকড়ি, আর-বেটাদের বিশ্বাস নেই বটে, কিন্তু সুহৃৎ কথনও নিমকহারামী করবে না।

নকড়ির তাড়া ছিল। আর বসতে পারলে না। যাবার সময় ব'লে গেল, বাবুর সঙ্গে এখুনি একবার দেখা করতে যাবেন যেন নিশ্চয় ক'রে।

সুহৃদের কামানো হয়ে গিয়েছিল। সে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে নকড়ির দিকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

পরস্পরের মধ্যে যেখানে স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধা নেই, যেখানে কৃতজ্ঞতাই একমাত্র বন্ধন, সেখানে চিরজীবন এক জনের আর এক জনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা যে কত বড় বিড়ম্বনার ব্যাপার সুহৃৎ সে কথা আপন মনে ভাবতে লাগল। নিখিলের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্যও সে দিতে পারে না। কিন্তু কেন পারে না? নিখিলের ভগ্নীপতি তার একটা চাকরি ক'রে দিয়েছেন। সেও কিছু স্নেহবশে নয়। সুহৃদের সঙ্গে তাঁর কোন আত্মীয়তা নেই, কিংবা কোনো রকম স্নেহের সম্পর্কও নেই। বস্তুত পূর্ব্বে তিনি সুহৃৎকে চিনতেনই না। জামাইমানুষ, মাঝে মাঝে শ্বশুরালয় আসতেন। হয়ত তাকে

দেখেনও নি। কিংবা দেখে থাকলেও সে নিতান্তই চোখের দেখা। তার বেশী নয়। সুহৃদের ক্ষেত্রে বলা চলতে পারে—যেমন আরও অনেক গরীব ভদ্রসন্তানের তিনি চাকরি ক'রে দিয়েছেন, তেমনি সুহৃদেরও দিয়েছেন। সে-কথা আজ হয়ত তাঁর মনেও নেই। মাঝে মাঝে যদি কখনও সুহৃদের সঙ্গে দেখা হয়, সুহৃৎ নমস্কার করে, তিনিও অন্যমনস্ক ভাবে সে নমস্কার ফিরিয়ে দেন। এই পর্য্যন্ত। এর জন্যে যদি কারও কাছে সুহৃৎ ঋণী, তো সে তাঁরই কাছে। বড় জোর নিখিলের স্বর্গীয় বাপ-মার কাছে। নিখিল তখন নিতান্ত ছোট। এ ব্যাপারে তার কোনো কৃতিত্ব নেই। কিন্তু সুহৃৎ তার পাড়াগেঁয়ে স্বভাবের গুণেই হোক, অথবা অন্য যে-কোন কারণেই হোক ব্যাপারটিকে এমন ক'রে ভাবতে পারে না। অর্থের ঋণ যেমন পিতার কাছ থেকে পুত্রে অর্শায় এও তাই মনে করে।

তথাপি সুহৃৎ খুব দুঃখিত হ'ল, ব্যথিত হ'ল। নিখিল কোন স্নেহের সম্পর্ক স্বীকার করে না। কৃতজ্ঞতার শিকলে তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধতে চায়। সেই জোরে জোর খাটিয়ে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তার মনুষ্যত্বকে আঘাত দিতে চায়। তার কাছে সুহৃৎ শুধু মাত্র মোটা প্রজা এবং ঋণী। ক্রীতদাসের আত্মার ওপর মনিবের যেমন পুরুষ-পরম্পরা দখলী-স্বত্ব জন্মে, সুহৃদের উপরও তার তেমনই জন্মেছে। তার এই মনোভাব সুহৃদের বুকে বড় বেশী ক'রে বাজল। তবু চুপ ক'রে রইল। এ দুঃখের কথা ব'লে বোঝাবার নয়।

নকড়ি ফের ঘুরে এল। তার কাছে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলে, পঞ্চা হারামজাদা সকালে আপনার কাছে এসেছিল শুনলাম?

কার কাছে শুনেছে তা আর বললে না। সুহৃৎ তার দিকে ফিরে চাইলেও না। অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলে হুঁ।

—কি বললে ব্যাটা?

তেমনি ভাবে সুহৃৎ জবাব দিলে, কিছুই বললে না।

—কিছুই বললে না? বলেন কি?

সুহৃৎ কিছুই জবাব দিলে না। .চাকরটাকে ডেকে বৈঠকখানার বারান্দাটা ঝাঁট দিয়ে মাদুরটা পেতে দিতে বললে। নকড়ি পঞ্চুর বক্তব্য শোনবার জন্যে আরও কিছুক্ষণ বৃথা অপেক্ষা ক'রে আপন মনে কি ভেবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে চলে গেল।

সেও এদিক দিয়ে গেল, ওদিক দিয়ে এল অখিল। অখিল ছোটবাবু হ'লেও নিখিলের বড়। তার খুড়তুতো ভাই। সেই হিসেবে ছোট তরফ। অখিল সুহৃদের সমবয়সী, তার বাল্যসাথী। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে। এককালে দু-জনে যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। তার পরে এক জন পেটের চিন্তায় কলকাতা গেল, আর একজন দেশে থেকেই পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শোনা করতে লাগল। সুহৃৎ মাঝে মাঝে যখন বাড়ী আসে তখন অখিল হয়ত নিজের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে, মাথা ভুলে সাদর সম্ভাষণের সময়ও পায় না। ফলে, এখন আর সুহৃৎ ওদিকে যাওয়ার বড়-একটা প্রয়োজন বোধ করে না। এখন দু-জনে ক্বচিৎ দেখা হয়।

অখিল এসে তার মাদুরের এক প্রান্তে ব'সে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলে, কখন এলি? কালকে? খবর সবই রাখি। কেমন ছিলি? ভালো? বেশ ছোকরাটি সেজে আছিস কিন্তু। আমি তো বুড়ো হয়ে গেলাম। বাইরে থাকলে···

অখিল ছেলেবেলার মত সোল্লাসে তার পিঠে চাপড় দিলে। সুহৃৎ জানে ও কি জন্যে এসেছে। উৎকণ্ঠার সঙ্গে মনে মনে তারই প্রতীক্ষা করতে করতে বাইরে শুধু একটু ফাঁকা হাসলে।

অখিল বললে, তোরা বেশ আছিস ভাই। দশটা-পাঁচটা আপিস করিস আর শনিবার-শনিবার বাড়ী আসিস। খাসা আছিস। কোন হাঙ্গাম নেই। গ্রামে থাকা, আর বাপের বিষয় বজায় রাখা যে কি ঝকমারি ভাবতেই পারিস্ না।

সুহৃৎ আবার একবার হাসলে।

অখিল বললে, মাঝে মাঝে মনে হয়, সব ছেড়ে- ছুড়ে দিয়ে যেদিকে দুই চোখ যায় চলে যাই। এ ঝঞ্ঝাট আর পোয়াতে পারি না। কিন্তু বিষয়ের কীট আমরা, সাধ্যি কি চলে যাই!

অখিল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললে, এই দেখ না, কোথাও কিছু নেই পঞ্চু কামারের একটা হাঙ্গাম ঘাড়ে এসে চেপেছে।

সুহৃৎ তাড়াতাড়ি ব্যগ্রভাবে বললে, কেন ভাই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে ভায়ে-ভায়ে ঝগড়া করিস? মিটিয়ে ফেল। তুই ইচ্ছে করলেই মেটে।

বিষয়কর্ম্ম পরিচালনা ক'রে ক'রে বয়সে না হোক বুদ্ধিতে এবং মনে অখিল সত্যিই ঝুনো হয়েছে। মিষ্টি মিষ্টি হেসে বললে, মেটে? বেশ আমি রাজী, তুই মিটিয়ে দে।

এত অবলীলাক্রমে অখিল কথাটা বললে যে, সুহৃৎ কি বলবে খুঁজে না পেয়ে বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, পাশের পাঁচিলের আড়াল থেকে কে যেন একবার উঁকি দিয়েই মাথাটা সরিয়ে নিলে। কে ওটা?

কিন্তু পাঁচিলটা অখিলের পেছনে। সে টের পেলে না। তেমনি ভাবে হাসতে হাসতে বললে, এত সহজ নয় রে ভাই, এত সহজ নয়। চেষ্টার আমি ত্রুটি করি নি। নইলে ভাইকে কি আর সত্যিই আমি জেলে দিতে চাই ?

অখিল উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। সুহৃৎ সে হাসির শব্দে একবার চমকে তার দিকে চেয়েই আবার পাঁচিলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। আবার সেই মাথা। এবার সুহৃৎ স্পষ্ট দেখলে, নকড়ি ঘোষের মাথা। অখিল যে তার কাছে এসেছে এ খবর এরই মধ্যে নিখিলের কাছে পৌঁছে গেছে। তার পর হয় নিখিল নকড়ি ঘোষকে আড়ি পাততে পাঠিয়েছে, কিংবা সে নিজের ইচ্ছাতেই এসেছে। নিজের ইচ্ছায় নয়, এত সাহস তার হবে না। নিশ্চয়ই নিখিলই পাঠিয়েছে। সে দাঁতে ঠোঁট চেপে চুপ ক'রে রইল।

অখিল বলতে লাগল, আমাকে কি করতে বলিস তুই ? পঞ্চু আমার প্রজা। গরীব। কি মার সে খেয়েছে তুই ত নিজের চোখেই দেখেছিস। হ'লই-বা নিখিল ভাই। গরীব প্রজাকে যদি অন্যের উৎপীড়নের হাত থেকে না বাঁচাতে পারি, তো কিসের জমিদার আমি ? আমার তাহ'লে বানপ্রস্থ নেওয়াই উচিত।

অখিল দেখলে সুহৃৎ খুব মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনছে। গভীর আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল, তবু নিখিল যদি একবার আমাকে বলত, কিংবা তার নিজে এসে বলতে লজ্জা করে একজন লোক পাঠিয়েও জানাত যে, যা হ'য়ে গিয়েছে হ'য়ে গিয়েছে ব্যাপারটা মিটিয়ে দাও, তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি আমি

তখনই মিটিয়ে দিতাম। সত্যি বলতে কি, আমি এমনও ভেবেছিলাম যে, নিখিল যদি দিতে রাজী না হয় আমি নিজের পকেট থেকেও পঞ্চুকে দু-দশ টাকা দিয়ে, দুটো ভালো কথা ব'লে বিদায় করতাম। তা নয়, উলটে আমাকেই শাসিয়ে বেড়াতে লাগল, হ্যান করেঙ্গে, ত্যান করেঙ্গে। দেখ দেখি কাণ্ড!

সুহৃদের সন্দেহ আছে অখিল যা বলছে তার এক বর্ণও সত্য নয়। তবু অখিলের চোখ মুখ দেখে, তার আবেগপূর্ণ কথা শুনে কিছুতে তাকে অবিশ্বাস করতেও পারলে না। কেবল শেষ চেষ্টা ক'রে বললে, তোর দুটি হাতে ধরছি, এতে সবাই তোর সুখ্যাতিই করবে।

সুহৃদের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অখিল বললে, এই বত্রিশ বন্ধনের মধ্যে ব'সে বলছি, তুমি মিটিয়ে দিতে পার আমি রাজী। মামলায় যে টাকা আমার গেছে তা যাক। তা চাই নে। তুমি তো নিখিলের অন্তরঙ্গ লোক, দেখ না একবার চেষ্টা ক'রে। কিন্তু যদি না পার? তাহ'লে?

তাহ'লে যে কি, তা সুহৃৎ জানে। অভিভূতের মত শুধু অখিলের কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে বললে, তাহ'লে?

—তাহ'লে তোমাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে। একটি কথাও মিথ্যে বলতে হবে না। শুধু যা দেখেছ তাই। ব্যস্। রাজী?

সুহৃৎ জবাব দিতে পারলে না। শুধু পাঁচিলের দিকে একবার চাইলে। কাউকে দেখতে পেলে না। নকড়ি ঘোষ হয়ত চ'লে গেছে, কিংবা এখনও আড়ালে দাঁড়িয়েই আছে, কে জানে!

এমন সময়ে হারাধন পাইক লাঠি ঘাড়ে ক'রে এসে দাঁড়াল। ছোটবাবুকে দেখে হারাধন সসম্ভ্রমে প্রণাম করলে। অখিল তার দিকে ফিরেও চাইলে না। সুহৃৎকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, কি বলছিস ?

সুহৃৎ তথাপি জবাব দিতে পারলে না। হারাধনকে জিজ্ঞাসা করলে, কি খবর ?

—আজ্ঞে বাবু একবার তলব দিয়েছেন।

তলব ? নিখিল নিজে আসতে পারে নি, পেয়াদা দিয়ে তলব পাঠিয়েছে ? রাগে তার শরীর থর-থর ক'রে কেঁপে উঠল। মনে হ'ল, এই মুহূর্ত্তে তার ভগ্নীপতির দেওয়া চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই বিড়ম্বনার শিকল থেকে মুক্ত হ'তে পারলে সে বাঁচে।

কিন্তু অসীম তার সহ্যশক্তি। নিজেকে প্রাণপণে সংযত ক'রে শান্তকণ্ঠে বললে, এখন ত যেতে পারব না হারাধন। নিখিলকে বলগে, যদি সময় পাই সন্ধ্যের পর বরং যাব।

হারাধন মাটিতে লাঠি ঠুকে বললে, আজ্ঞে আপনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে বলেছেন।

হারাধন সুহৃৎকে ভয় দেখাবার জন্যে মাটিতে লাঠি ঠোকে নি, অভ্যাস বশে ঠুকেছে। কিন্তু সুহৃৎ আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলে না।

লাফিয়ে উঠে বললে, হারামজাদা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমি কি তোর বাবুর চাকর? যা বলগে যা বাবুকে আমি যেতে পারব না। তার দরকার থাকে সে এসে দেখা করতে পারে। আস্পর্দ্ধা!

তার রাগ দেখে হারাধন ভয়ে পালাল। অখিল তাড়াতাড়ি তার হাত ধ'রে বসাল। কিন্তু সুহৃদের রাগ যেন আর কিছুতে যায় না।

কাঁপতে কাঁপতে বললে, সাক্ষী দেওয়ার কথা বলছিলে, দেব আমি সাক্ষী। তুমি নির্ভাবনায় থাক।

অখিল অবাক্ হয়ে গেল। সে যেন কিছুতে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

সন্দিগ্ধভাবে বললে, সত্যি বলছ ত ভাই ?

সুহৃৎ বার-বার মাথা নেড়ে বলতে লাগল. হ্যাঁ, হ্যাঁ সত্যি। আমি যখন কথা দিলাম, তখন তার আর নড়চড় হবে না। কিছুতে না। আমার এক কথা।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে অখিল হাতখানা বাড়িয়ে দিলে।

ওপিঠ

সেদিন কিন্তু বিকাল হইতে এমন ঝড়বৃষ্টি নামিল যে, অমল এবং বিলাস আড্ডা জমিবার সমস্ত আশা ত্যাগ করিয়া বসিল।

অকস্মাৎ রাত প্রায় আটটার সময় ছাতা মাথায় দিয়া ঝপ্‌ঝপ করিতে করিতে অশোক আসিয়া উপস্থিত। ছাতীটা দরজার এক কোণে রাখিয়া ভিজা পা দুইটা ঠুকিয়া অশোক বলিল, বাপ্‌!

অমল ও বিলাস উল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, হুর্‌রে!

এই আড্ডাটীর উপর অশোকের মমতার সীমা ছিল না। কিন্তু এতটা পথ বৃষ্টিতে ভিজিয়া আসিলে সকলেই বিরক্ত হয়। সে ইহাদের একটা ধমক দিয়া বলিল, হয়েছে, হয়েছে, থাম। চ্যাঁচাসনে।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ক্রোধে নিজেই লজ্জিত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ঘরের মধ্যে আরামে বসে রয়েছ আর হুর্‌রে লাগাচ্ছ। কি যে বৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে গেল তা তো আর টের পাচ্ছনা।—বলিয়া একখানি রুমাল বাহির করিয়া মাথাটি মুছিতে লাগিল।

অমল বলিল, ভিজেছিস্‌ তো কি হয়েছে? বিলাসদা—

বিলাস হাত নাড়িয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, হচ্ছে হচ্ছে। জিরিয়ে নিক একটু।

অশোক তাড়াতাড়ি বলিল, না, না, আজকে না।

অমল প্রতিবাদে একটা কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া অশোক বলিল, না, না, ক'দিন থেকে বৌএর খুব অসুখ হয়েছে। প্রায় সমস্ত রাত জাগতে হচ্ছে।

বিলাস বলিল, রাত জাগতে হচ্ছে? তা হ'লে তো আরও বেশী দরকার। অমল—

Yes sir, বলিয়া অমল ড্রয়ারের মধ্যে হইতে একটা বোতল আর একটা গ্লাস বাহির করিল। তারপরে ফট করিয়া একটা সোডার বোতল ভাঙ্গিয়া চক্ষের নিমেষে খানিকটা মিকশ্চার করিয়া অশোকের সামনে ধরিয়া বলিল,—Please, sir.

মাথা ঈষৎ হেলাইয়া অশোক বলিল, Thanks. তারপর ঢক্ ঢক্ করিয়া সবটা এক নিশ্বাসে পান করিয়া বলিল, চমৎকার জিনিষ তো? White Label?

আর একটা মিকশ্চার তৈরি করিতে করিতে অমল বলিল, হুঁ, হুঁ, বাবা, জিনিস চিনলে না আজও। আমি তো গন্ধ শুঁকেই বলতে পারি।

আধ ঘণ্টা ধরিয়া ইহাই চলিল। অকস্মাৎ হুঁ হুঁ করিয়া একটা রাগিণী ভাঁজিয়া টেবিলে দুইটা তেহাই দিয়া অশোক বলিল, ভারি গান শুনতে ইচ্ছা করছে মাইরি।

বিলাস নবাবী চালে ঘাড়টা দোলাইয়া বলিল, কুছ্ পরোয়া নেই, ট্যাক্সি বোলাও, আমি দোব টাকা—বলিয়া একতাড়া নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

অমল নোটগুলা বিলাসের পকেটে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, টাকা দিবি তুই? অশোক থাকতে!

অশোক উত্তেজিত ভাবে টেবিলে দুইটা ঘুসি মারিয়া বলিল, I say, ট্যাক্সি বোলাও!

একেবারে সটান কুন্দরাণীর বাড়ী।

কুন্দরাণী সাজিয়া গুজিয়া বসিয়াই ছিল। অমল তাহার রূপ, তাহার সজ্জা দেখিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, বিউটীফুল !

কুন্দ সহাস্যে সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

বিলাস বলিল, তোমার গান শুনতে এলাম, কুন্দ।

কুন্দ বলিল, কি গাইব হুকুম করুন।

অমল মধ্য হইতে বলিল, যা খুসী, যা খুসী,—বিরহ, মিলন, মান, অভিমান—anything.

অমলের অবস্থা দেখিয়া কুন্দ হাসিয়া ফেলিল। পয়সা যেখানে পরের পকেট হইতে ব্যয়িত হয়, সেখানে সে নিজের পেটের আন্দাজ রাখিতে পারে না।

কুন্দ গাহিল,—'বঁধু হে, আর কোরো না রাত'।

গান চলিল, বাজনা চলিল,—অনেক গান এবং অনেক বাজনা। এমনি জমজমাটের মধ্যে কুন্দ অকস্মাৎ দেখিল, অমল ফরাসের একপ্রান্তে ফ্ল্যাট হইয়া একটা তাকিয়া বুকে করিয়া পড়িয়া আছে এবং বিলাস ফরাসে বসিয়া খাটের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া গানের তালে তালে মাথা নাড়িতেছে।

গোড়ার দিকে এক একটী হৈ হৈ ও চীৎকার চলিয়াছিল, কিন্তু তাহা যে কখন আপনা হইতেই থামিয়া গেছে তাহা কেহই টের পায় নাই।

বাহিরে তখনও বৃষ্টি একেবারে থামিয়া যায় নাই। অশোক রুদ্ধ কাচের জানালা দিয়া রাস্তার স্বল্পালোকে ঝাপ্সা বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা সে কহে নাই। প্রতিদিনের মত কুন্দকে একটা সম্ভাষণও জানাইতে কোথায় যেন

তাহার বাধিতেছিল। গানের মধ্যখানে একটা লাইন হারাইয়া গেলে গায়ক যেমন অস্বস্তি বোধ করে, তেমনি কিসের একটা অস্বস্তি যেন তাহার বুকের মধ্যে ছটফট করিতেছিল।

কুন্দ গান থামাইয়া তাহার হাত ধরিয়া বাহিরের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, শোন।

অশোক নির্ব্বিকারভাবে বাহিরে আসিয়া রেলিঙে ঠেস দিয়া কুন্দের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

কুন্দের মুখখানি সুন্দর, এবং অশোকের নেশার একটু আমেজ তখনও আছে।

কুন্দ একটা কড়া কথা বলিতেই আসিয়াছিল। অশোকের হাতখানা দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার হাতের মধ্যে ধরা ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার পানে চাহিয়াই মুখ নামাইয়া ফেলিল। দূরের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া যেন অর্দ্ধস্বগতঃ বলিল, আমি যে সুন্দর সে বুঝেছি তোমায় পাওয়ার পর।

প্রথমটা অশোক চমকিয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অকস্মাৎ রূঢ় ভাবে বলিল, থাক। কি তোমার কথা তাই বল।

এই রূঢ়তায় কুন্দ তীব্র দৃষ্টিতে তাহার পানে একবার চাহিল। তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তুমি চারদিন এখানে আসনি।

অশোক বলিল, না।

কুন্দ বলিল, শোভনার অসুখ কি খুব বেশী ?

—খুব নয়।

কুন্দ আবার বলিল,—তুমি এখুনি যাবে ?

অশোক হাত ঘড়িটা দেখিয়া বলিল, হাঁ। দশটা বাজে।

কুন্দ তাহার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া বলিল, তাই যাও।

তার পরে একটু হাসিয়া ঘরের ভিতরে আঙুল দেখাইয়া বলিল, কিন্তু ওদের কি করবে?

অশোকও হাসিয়া ফেলিল। বলিল, তাই তো!

কুন্দ বলিল, এই অবস্থায় ওদের টানাটানি করতে পারবে?

সংশয়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়া অশোক বলিল, অসম্ভব।

কুন্দ বলিল, তা হ'লে!

ঈষৎ হাসিয়া অশোক বলিল, থাক্ না এইখানেই।

কুন্দ সভয়ে পিছাইয়া গিয়া বলিল, বাপ্‌রে!

অশোক তাহার একখানি হাত ধরিয়া সুমুখের দিকে টানিয়া বলিল, একটা রাত্তির তো। পারবে না?

কুন্দ দ্বিধার ভঙ্গিতে কিন্তু নরম স্বরে বলিল, তুমি থাকবে না আমি একলা, সামলাতে পারব?

অশোক অসহিষ্ণুভাবে তাহার হাতখানায় ঝাঁকি দিয়া বলিল, কি ন্যাকামি কর কুন্দ,—এমন অবস্থার লোক সামলান কি এই প্রথম?

কুন্দর মুখ সহসা ব্যথায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল। একটু সামলাইয়া কুন্দ তীব্র ভাবে বলিল,—প্রথম নয় তা জানি। কিন্তু এর আগে যারা রেখে গেছে তারা মজুরি পুষিয়ে দিয়ে গেছে। তোমার যে তাদের সোফারের মুরোদও নেই, একথা ভুলে যাও কেন?

দাঁতে দাঁত চাপিয়া অশোক কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তার পর প্রশ্ন করিল, কত তোমার মজুরি?

কড়া কথা বলিয়া ফেলিয়াই কুন্দ নিজের মনেই অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। আব্দারের ভঙ্গিতে অশোকের আঙুলগুলা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা, হয়েছে, হয়েছে। রাগটুকু বেশ আছে।

স্থির হইল বিলাস ও অমল রাত্রিটা এখানেই কাটাইবে। অশোক বরং সকালে একবার আসিয়া দেখিয়া যাইবে।

অশোক যখন বাড়ী পৌঁছিল তখন রাত প্রায় এগারোটা।

পীড়িতা স্ত্রী দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া ঘুমাইতেছে, এবং বৃদ্ধা মাতা শয্যার শিয়রের দিকে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছেন।

অশোকের পায়ের শব্দ পাইয়া তিনি তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন। অশোককে শব্দ করিতে নিষেধ করিয়া চুপি চুপি বলিলেন, ঘুমোচ্ছে।

সেইরূপই মনে হইল। কিন্তু আহারাদি সারিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া অশোক নিদ্রিতার দিকে সুমুখ ফিরিতেই শোভনা ঝাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া হাসিতে লাগিল।

অশোক বিস্মিত হইয়া বলিল, ও কি, ঘুমোওনি তুমি?

শোভনা ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া অশোক বলিল, রাত যে বারোটা বাজে।

—বাজুক বারোটা।—আব্দারের সুরে শোভনা বলিল,—বাবা! তিনদিন ধরে ঘুমোচ্ছি, আর কত ঘুমোতে পারে মানুষ!

অশোক হাসিল। বলিল, ডাক্তার কি বলে গেছে শুনেছ?

বিরক্ত হইয়া শোভনা বলিল, শুনেছি। বলে গেছে সাগু আর বার্লি আর কুইনিন খেতে, আর দিন রাত্তির ঘুমুতে। ডাক্তারের কি? তাকে তো আর তিনদিন ধরে বিছানায় প'ড়ে থাকতে হচ্ছেনা।

অশোক মুগ্ধনেত্রে রুগ্না স্ত্রীর বিবর্ণ, ক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়াছিল। সে দৃষ্টিপাতে সলজ্জভাবে মুখ নামাইয়া শোভনা পূর্ব্বকথার অনুবৃত্তি করিয়া বলিল, নিজের কথা মনে কর তো?

—কি করি আমি?

—হয়েছে! কি কর? সেবারে গান গেয়ে, হেসে, কেঁদে চীৎকার করে' সাতদিন পাড়ার লোককে তিষ্ঠুতে দাওনি। মনে নেই সেকথা?

অশোক হাসিতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিবাহের মিছিলের বাজনা শোনা গেল। উসখুস্ করিতে করিতে শোভনা বলিল, এই দিক দিয়েই আস্‌বে বোধ হয়।

অশোক হাসিয়া বলিল, বোধ হয়। কিন্তু তুমি উঠ না।

মিনতির সঙ্গে শোভনা বলিল, একটুক্ষণ তো। তুমি বরং আমায় ধরে' থাক্‌বে।

এ মিনতি অশোক উপেক্ষা করিতে পারিল না।

দুজনে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সুমুখ দিয়া আলোয় ও বাজনায় রাজপথ সচকিত করিয়া মিছিল চলিয়া গেল।

বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়াছে। অল্প স্বল্প মেঘ স্থানে স্থানে আটকাইয়া আছে।

অশোক বলিল,—চল।

এইটুকু দাঁড়াইয়া দেখিতেই শোভনা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। শ্রান্তিভরে অশোকের বাহু আশ্রয় করিয়া শোভনা ভিতরে আসিল।

অশোক মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলিল, দেখ তো কি দুর্ব্বল হয়েছ? বললাম তখন—

সে শোভনার মাথার বালিশ ঠিক করিয়া তাহাকে শোওয়াইয়া দিল। শোভনা এবার বাধা দিল না। শুধু অশোকের একখানা হাত মুঠার মধ্যে লইয়া বুকের উপর রাখিল এবং অসীম শ্রান্তিভরে চোখ মুদ্রিত করিল। একবার যেন অশোককে বলিতেও চাহিল, তুমি শোও। কিন্তু পারিল না।

স্বামীর গল্প শোনা শোভনার একটা রোগ। বোধ হয় এ তার বয়সের দোষ।

দুপুর বেলায় একবার করিয়া ভবসুন্দরীর আসা চাই-ই। গল্প হয় তারই সঙ্গে। ভব একাধারে শোভনার সখী ও সচিব। বয়স তাহার পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। বছর তিনেক পূর্ব্বে গুটি তিনেক ছেলে-মেয়ে লইয়া বিধবা হইয়াছে।

ভব বলে, তুই অমন করে অশোকের পেছনে-পেছনে দিন রাত্তির ঘুরিস কেন বল তো?

শোভনা হাসে। বলে, কেন তোমার কি হিংসা হয় নাকি?

ভব বলে, বুড়ির কথা এখন মিষ্টি লাগছে না। এর পরে দেখবি।

শোভনা ভবর কথার ভঙ্গিতে ভয় পায়। মুখের হাসি মুখে মিলাইয়া যায়। ভবর পাশে ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলে, কি দেখব? বল না ঠান্‌দি।

ভীরু মেয়ের গাল দুটা টিপিয়া দিয়া ভব বলে, অমন বরের ন্যাওটা হোসনে, বরের আদর কমে যায় তাহ'লে। বুঝলি?

অতঃপর ভব স্বামীর ভালবাসা আদায় করিবার যাবতীয় কৌশল তাহাকে শিখাইয়া দেয়।

এমন সময় হয়ত অশোক আপিস হইতে ফিরিয়া আসে। তাহার জুতার শব্দ কাণে পৌঁছিতেই শোভনা দেয় ছুট। এক নিমেষে সকল কৌশল ভুলিয়া যায়।

ভব হাসিতে হাসিতে মেঝের পরে আঁচল পাতিয়া আবার শুইয়া পড়ে।

ও ঘরে অশোক বলে, বেশ তো বসে' গল্প হচ্ছিল। আবার ছুটতে ছুটতে এ ঘরে আসা কেন?

শোভনা একখানা চেয়ার টানিয়া তাহার উপর বসিয়া বলে, বেশ করেছি।

ভবর দুপুর বেলাটা শোভনাকে লইয়া কাটে। অসুখের ক'দিন রোগিণীর চেয়ে তাহারই হইয়াছিল মুস্কিল। রোগীর পাশে বসিয়া থাকা সে সহ্য করিতে পারে না।

দুদিন হইতে জ্বরটা ছাড়িয়া গিয়াছে। শোভনা বসিয়া বসিয়া একখানা নভেল পড়িতেছিল।

ভব পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া বলিল, আজ আর জ্বর হয় নি তো?

শোভনা রাগিয়া বলিল, হয়েছে, সান্নিপাতিক বিকার—

সকাল হইতে দশজন লোক না হ'ক দশবার তাহাকে এই প্রশ্ন করিয়াছে।

ভব সস্নেহে তাহার কপাল স্পর্শ করিয়া বলিল, না, জ্বর আর নেই—বলিয়া একটা পাশ বালিশ টানিয়া শুইয়া পড়িল এবং কটাক্ষে হাসিয়া বলিল, আঃ! তোর বরের বিছানায় শুলাম ভাই। হিংসে করিসনে যেন।

এক মুহূর্ত্তে শোভনার মনের সমস্ত উত্তাপ গলিয়া জল হইয়া গেল। ছোট মেয়ের মত খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, কিন্তু এখন তুমি মিথ্যে শুলে ভাই ঠান্‌দি। বরং রাত্তির বেলায় এসো।

ভব বলিল, তা যেন এলাম। কিন্তু তুই কি করবি? চামর ঢুলোবি?

ভব তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল। শোভনা তাহার কাণে কাণে বলিল সত্যি ভাই ঠান্‌দি, ভারি হিংসে করে।

ভব গম্ভীর ভাবে তাহার কপালের কেশগুচ্ছ সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, ভয় নেই, আমি ত' আর সত্যিই আসছি না।

শোভনা অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া বলিল, আহা, তোমার কথাই যেন বলছি আমি। বেশ তো এসনা।

ভব ক্ষীণ ম্লান হাসিয়া বলিল, না ভাই আর এসে কাজ নেই। একজন যা জ্বালিয়ে গেছে তাতে মনে মনে এই কামনা করি যেন, আস্‌ছে বারে নারী জন্মও যদি হয়, বিয়ে যেন না হয়।

শোভনা চকিতে তাহার বুক ছাড়িয়া উঠিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। পরে রূঢ়ভাবে বলিল, ঠাকুর্দ্দা যাওয়াতে তুমি তা হলে সুখী হয়েছ বোধ হয়।

ভব যেমন দূরের দিকে চাহিয়া ছিল তেমনি রহিল। যেন অর্দ্ধস্বগত ভাবে উত্তর দিল, সুখ দুঃখের কথাতো নয় বোন, এ আমার নিজের মনের কথা। কিন্তু একথা যেন তোকে না বুঝতে হয়!

ইহার পর সেদিন আর গল্প জমিল না। দুটী প্রাণী স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। বিকালের দিকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভব উঠিয়া গেল।

চিরদিনের মত আজ আর বিদায় জানাইতেও শোভনার ইচ্ছা হইল না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আফিস হইতে ফিরিবামাত্র শোভনা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ঠান্‌দির বর কি ঠান্‌দির ওপর খুব অত্যাচার করতেন?

অশোক কোটের বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিল, অত্যন্ত।

অশোকের ঔদাসীন্যে বিরক্ত হইয়া শোভনা বলিল, যাও। ঠাট্টা ভালো লাগে না। সত্যি বলনা ?

অশোক বলিল, সত্যিই তো বললাম।

জামাটা আলনার পরে রাখিয়া অশোক বলিল, কেন ঠান্‌দির পিঠের মারের দাগ এখনও মিলায় নি ?

শোভনা ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, আহা সেই কথাই যেন আমি বলছি। ভদ্রলোক বুঝি আবার বৌকে মারে ?

অশোক টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মারেনা ? শুধু কাণ মলে দেয় বুঝি ?

শোভনা গম্ভীরভাবে বলিল, না, সত্যি ঠাট্টার কথা নয়। ঠান্‌দি আজকে দুঃখ করছিল। ঠান্‌দির বর নাকি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন নি।

শোভনা যখন গম্ভীর হয় তখন আর অশোক হাসি চাপিতে পারে না। তবু পাছে শোভনা চটিয়া যায়, এই ভয়ে গম্ভীর হইয়াই বলিল, ঠাকুর্দ্দার স্বভাব-চরিত্র বড় ভাল ছিল না।

শোভনা উত্তেজিতভাবে খাট ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সত্যি ভাল ছিল না ? সত্যি ?

অশোক একটু বিব্রতভাবে বলিল, তাইতো সবাই বলে।

শোভনা বলিল, আমি হ'লে কখনো এ সইতাম না, কক্ষনো। কি আশ্চর্য্য !

অশোক হাসিয়া বলিল, কি করতে ?

—আমি তা' হ'লে,—বলিয়া শোভনা বিব্রতভাবে থামিয়া পড়িল। কি যে করিত তাহা আর ঠিক করিতে পারিল না। শুধু

পক্ষীশাবক যেমন ভয় পাইয়া জননীর পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করে, তেমনি করিয়া এই ভীরু বালিকা স্বামীর একান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিল এবং অসহায়ভাবে বলিল, কিন্তু তুমি তো তেমন নও।

মমতায় অশোকের মন ভরিয়া উঠিল। তবু প্রশ্ন করিল, কেমন করে জানলে ?

এবার গরবিনীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া শোভনা বলিল, সেটুকু বুঝতে পারি, মশাই। তোমাদের স্পর্শ থেকে বুঝ্‌তে পারি খাঁটি কি মেকি।

অকস্মাৎ অশোকের মনে যেন একটা কাঁটা বিঁধিল। ঠোঁটে শুষ্ক হাসি টানিয়া বলিল, তবে আর কি ? এইবার চা নিয়ে এস।

ওমা, তাইতো !—বলিয়া অপ্রস্তুত ভাবে শোভনা তাড়াতাড়ি চা আনিতে নীচে ছুটিল।

চা আনিয়া বলিল, তুমি এক্ষুনি বেরুবে ?

অশোক বিস্মিতভাবে বলিল, কেন বল তো ?

শোভনা কিছুই বলিতে পারিল না। শুধু নতমুখে কাপড়ের একটা প্রান্ত আঙ্গুলে জড়াইতে লাগিল।

অশোক হাসিয়া বলিল, আজকে আর কোথাও বার হব না।

আনন্দে শোভনার মনে হইল সে বুঝি কাঁদিয়া ফেলিবে।

কিন্তু অশোকের বাহিরে যাওয়ার বিশেষ দরকারই ছিল।

কয়দিন ধরিয়াই কুন্দর বাড়ী যাওয়া হয় নাই। কাল কুন্দ

একখানা কড়া চিঠিই লিখিয়াছে:। আজ অফিস ফেরৎ সটান ওখানে না গেলে আত্মহত্যা করিবার ভয়ও দেখাইয়াছে।

আফিস ফেরৎ আর যায় নাই। ভাবিয়াছিল শোভনা কেমন থাকে দেখিয়া সন্ধ্যার দিকেই যাইবে।

তারপরে এই বাধা।

কুন্দ লিখিয়াছে, যেদিন অশোকের কেহ ছিলনা, যেদিন ছিল কুন্দ। সেদিনে আফিসের ছুটী হওয়া পর্য্যন্ত অশোকের তর সহিত না। আর আজ সপ্তাহে একদিন করিয়া এক ঘণ্টার জন্য দর্শন দিবারও অবকাশ পাইতেছে না। এ সমস্তই তাহার অদৃষ্ট।

তারপরে সুদীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী অতীত দিনের বিবিধ সুখ-দুঃখের স্মৃতি-কথা লিপিবদ্ধ করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছে:—পুরাণো স্মৃতি জাগিয়ে লাভ নেই। তবু লোভ হয়, তাই লিখলাম। তোমায় শুধু একটী প্রশ্ন করি, জয় করেছ বলেই কি আমার ওপর অত্যাচার করবার অধিকারও জন্মেছে? কিন্তু কাল আমার জন্মতিথি। শুধু দু'মিনিটের জন্য একবার এস। তাতে সম্ভবতঃ তোমার চরিত্র নষ্ট হবার ভয় নেই।

চিঠিতে খোঁচা ছিল যথেষ্টই, অশোকের যাওয়ার ইচ্ছাও কম ছিলনা, তবু এই একান্ত নির্ভরশীলাকে 'না' বলিতে বাধিল।

এমন সময় বিলাস ও অমল বাইরের দরজায় হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল।

অশোক বলিল, একটু বোস, লক্ষ্মীটি, আমি এক্ষুনি আসছি।

নীচে আসিয়া অশোক বিরক্তভাবেই বলিল, কি?

অমল বলিল, কি বাবা সাপের পাঁচ পা দেখেছ না কি?

বিলাস তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, আঃ। তুই থাম না; অমল। আমি বলছি।

অমলের বুদ্ধি এবং দৃষ্টি দুইটাই স্থূল। সে চীৎকার করিয়া করিয়া বলিল, তুই আবার বলবি কি? বলা-বলির আছেই বা কি? বাবা অশোকচন্দ্র, তুমি জামাটি গায়ে দিয়ে লক্ষ্মী ছেলেটির মত আমাদের সঙ্গে চল। কুন্দরাণীর হুকুম। জীবিত কি মৃত তোমাকে ধরে' নিয়ে যাওয়া চাই।

অশোক দৃঢ়ভাবে বলিল, আজকে যাওয়া হ'তে পারেনা। তাকে ব'ল কালকে বরং—

অমল চীৎকার করিয়া বলিল, বরং-টরং বুঝি না, আজকেই যেতে হবে।

অশোক ধীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

বিলাস গম্ভীরভাবে বলিল, না যেতে চাও নাই গেলে। তোমায় জোর করে ধরে' নিয়ে যেতে আমরাও চাইনে। শুধু একটা কথা ব'ল যাই, কুন্দ শুধু তোমারই প্রতীক্ষায় এতক্ষণ পর্য্যন্ত অভুক্ত বসে রয়েছে। এর পরেও যদি তোমার মনে হয়, তোমার যাওয়া সঙ্গত নয়, যেওনা তুমি।

অশোক দ্বিধাভরে একটু ইতঃস্তত করিতে লাগিল।

অমল পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিল, তুমি যাবে কিনা শুনতে চাই।

অশোক ব্যস্ত হইয়া বলিল, চ্যাঁচাস নে।—বলিয়া উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইসারায় জানাইয়া দিল, উপরে তাহার স্ত্রী শুনিতে পাইবে।

অমল হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, পেলই বা শুনতে। আমার স্ত্রী তো সব জানে। আমি নিজেই সব কথা বলেছি।

অশোক বিরক্তভাবে বলিল, অতি উত্তম করেছ।

বিলাস বলিল, তাহ'লে আমরা ফিরে যাব?

অশোক অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল। শোভনার ভীরু সুকুমার মুখখানি কেবলই তাহার মনের সামনে ভাসিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, আজ কোনমতেই যেতে পারব না, কালকে যাব নিশ্চয়।

অমল ও বিলাস চলিয়া গেল। কিন্তু অশোক আর শোভনার ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারিল না। পাশের পড়ার ঘরে গিয়া সামনেই যে বইখানি পাইল তাহাই খুলিয়া একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িল।

কথা সমস্তই শোভনার কাণে গেল। অমলের অট্টহাস্য ও চীৎকার, বিলাসের কটু গাম্ভীর্য্য এবং অশোকের ভীত ত্রস্ত ভাব সমস্তটা মিলিয়া ব্যাপারটাকে এমন সহজ সরল ও বীভৎস করিয়া তুলিল যে শোভনা কাঠ হইয়া জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘটনাটি অত্যন্তই আকস্মিক।

তাহার অতীত মিথ্যা হইয়া গেছে, বর্ত্তমান ভূয়া হইয়া গেল, ভবিষ্যৎ স্বপ্নসৌধ আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল। সমস্ত দিন কাঁদিয়া এই কথাটাই বারবার মনে করিতে লাগিল।

অশোক আসে যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। শোভনা সমস্ত দিন লুকাইয়া লুকাইয়া ফেরে। তাহার সমস্ত গর্ব্ব ধূলিসাৎ হইয়া গেছে, এই লজ্জাতেই সে যেন কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিতে-ছিল না,—অশোককেও না। বস্তুত কাল রাত্রে সে অশোক আসিবার পূর্ব্বেই এমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল যে, অশোক ঠেলাঠেলি, হাঁকাহাঁকি করিয়াও কোনো মতে তাহার নিদ্রা ভাঙাইতে পারে নাই।

দুপুর বেলায় ঠান্‌দি আসিয়া একলাই খানিকটা দিবানিদ্রা উপভোগ করিয়া গেছে।

অপরাহ্নের দিকে শোভনা অকস্মাৎ যেন কি একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া শয়নকক্ষে অশোকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া অশোক বলিল, কিগো, ঘুম ভাঙল?

শোভনা হাসিয়া বলিল, ঘুমোইনি তো?

অশোক তার গাল দুইটা টিপিয়া দিয়া বলিল, দুপুরের কথা হচ্ছেনা গো, আমি কাল রাত্রের কথা বলছি।

শোভনা নিজেকে মুক্ত করিতে করিতে বলিল, কি জানি, ভারি ঘুম পেয়েছিল।

অশোক উদ্বেগের সঙ্গে বলিল, শরীর খারাপ করেনি তো?

এ কথার আর শোভনা কোনো উত্তর দিলনা। বলিল, একটু বোসো, তোমার চা আনি।

চা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া শোভনা প্রশ্ন করিল,—তুমি কি এখনই বেরুবে?

অশোক একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, বেরুতে হবে একবার। একটু দরকার আছে।

বুঝি তাহার একটু ভয়ও হইল পাছে আজও শোভনা আব্দার করিয়া বসে। তাই কৈফিয়তের সুরেই বলিল, শিগ্‌গির ফিরে আসব'খন। দেরি বেশী হবে না।

অশোক বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই শোভনা বলিল, ওকি, তুমি অমনি পোষাকে বাইরে যাবে নাকি?

অশোক হাসিয়া বলিল, তার মানে?

সমস্ত দিন ধরিয়া শোভনা বসিয়া বসিয়া তাহার কাপড় কোঁচাইয়াছে, একটা আদ্দির পাঞ্জাবি গিলা করিয়াছে এবং ভালো একটা জুতায় নিজেই কালি লাগাইয়া বার্ণিশ করিয়াছে। সেগুলি বাহির করিয়া সে অশোককে সাজাইতে বসিল। গলায় একটা জরিপাড় উড়ানি জড়াইয়া দিল, রুমালে এসেন্স লাগাইয়া দিল এবং জুতা পরাইয়া দিয়া অঞ্চল দিয়া আর একবার পরিষ্কার করিয়া দিল।

মাঝে মাঝে শোভনার এমনি এক একটা সখ চাপে। বারণ করিয়া থামান যায় না। সমস্ত শেষ হইলে অশোক তাহার মাথায় একটা হাত রাখিয়া নাটকের ভঙ্গীতে আশীর্ব্বাদ করিল, চিরায়ুষ্মতী ভব। কিন্তু এ অভিনয়ের মানে তো বুঝলাম না।

ম্লান হাসিয়া শোভনা বলিল, অভিনয় নয়।

কথার মধ্যে বোধ করি একটু বিষাদের সুর ছিল। অশোকের মনে পড়িল, বিবাহের পর প্রথম প্রথম শোভনা এমনি করিয়া প্রতিদিন তাহাকে সাজাইয়া সন্ধ্যার দিকে বেড়াইতে পাঠাইত।

তখন সে কিশোরী। তার পর দীর্ঘ কয় বৎসরে এ ব্যবস্থা কেমন করিয়া লোপ পাইয়া গেল।

তার পরে আবার এই বুঝি আরম্ভ হইল।

সমস্তক্ষণ শোভনা মুখ নামাইয়া ছিল, একবারও তোলে নাই। এতক্ষণ পরে বলিল, তুমি তো খাওয়া দাওয়া করেই আসবে ?

অশোক বলিল, তার মানে ?

—তার মানে কালকে তোমার বন্ধুরা বলছিলেন কার নাকি জন্মতিথি।

অশোক যেন অকস্মাৎ চাবুক খাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিল। এবং আত্মরক্ষার শেষ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া কুকুর যেমন পলায়নের উপায় না পাইয়া মরিয়া হইয়া আক্রমণকারীকে আক্রমণ করে, তেমনিভাবে বলিল, বেশ তো, তার হয়েছে কি ?

শোভনা কঠিন দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিল।

অশোক আবার বলিল, সেখানে গেলেই কিছু চরিত্র নষ্ট হয় না।

এ কথায় শোভনার হাসি পাইল। সে বলিল, এতদিন ধরে' তুমি আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে' এসেছ। আজ একটি সত্যি কথা বলবে ? তোমার কি সত্যিই আমায় ভালো লাগেনা ?

উত্তরে অশোকের বলিবার কথা অনেক ছিল। কিন্তু নিজের অপ্রস্তুত অবস্থায় সে ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাই রূঢ়ভাবেই বলিল, না।

—কেন ভালো লাগেনা ? আমি কি একেবারে পুরোন হ'য়ে গেছি ?

এ সম্বন্ধে ও প্রকৃতপক্ষে অশোক কোন কথাই ভাবে নাই। কিন্তু সম্প্রতি সে একটা গল্প পড়িয়াছিল এবং তাহারই যতটুকু স্মরণ ছিল তাহাই আবৃত্তি করিয়া বলিল, আমি যা চাই, তার সব তোমার মধ্যে নেই। সমস্ত অন্তর দিয়ে যে তিলোত্তমা আমার কামনার বস্তু, তাকে পেতে হলে সহস্র নারীর শ্রেষ্ঠতম অংশ তিল তিল ক'রে আমায় সংগ্রহ করতে হবে। এতে তোমার কি ক্ষতি? তোমায় তো আমি কখন অনাদর করিনি।

শোভনা স্বীকার করিল, তা' কর নি।

জোর পাইয়া অশোক বলিল, তবে?

কঠিন মুখে শুষ্ক হাসি টানিয়া শোভনা বলিল, আজকে আমি নিজের হাতে সাজিয়ে তোমায় অভিসারে পাঠাচ্ছি। তিলোত্তমার লোভ আমারও তো থাকতে পারে। তার জন্যে আমাকে নিজের হাতে সাজিয়ে অভিসারে পাঠাতে পার তুমি?

প্রশ্নটা এতই আকস্মিক যে বিহ্বলের মতো অশোক বলিল, তোমায় নিজের হাতে সাজিয়ে?

—হাঁ? মনে কর আজকে একই মোটরে আমরা অভিসারে বার হব। তুমি যাবে তোমার কুঞ্জে, আর আমি আমার কুঞ্জে।

—একই মোটরে?

—ক্ষতি কি?

অশোক তীব্র দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

বীণাপাণি নাট্যসমাজ

পূজার আর বেশী দেরী নাই। ভিজা খড়ের চালে, আতাগাছের পাতায়, প্রশস্ত উঠানে সোনালি রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। শিউলি গাছে অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। প্রস্ফুটিত কাশ-বন হাওয়ায় দুলিতেছে। দুই একটি শাদা মেঘের টুক্‌রা অন্যমনে ভাসিয়া চলিতেছে। এমন সময় বহু লোকের পদশব্দে চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি প্রায় সমগ্র গ্রামই আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত।

মৃত্যুঞ্জয় প্রবীণ ব্যক্তি। তিনিই যাত্রার দলের ম্যানেজার। যাঁহাদের সঙ্গে প্রথম তিনি 'বীণাপাণি নাট্যসমাজ' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকে স্বর্গীয় হইয়াছেন, বাকী সকলে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ছুটি মিলে নাই কেবল তাঁহার। একদা তাঁহার সঙ্গে যে ছোট রাজকুমারের বক্তৃতা লইয়া প্রথম আসরে নামিয়াছিল কালক্রমে সে দ্রোণাচার্য্যের বক্তৃতা করিয়া অবশেষে 'রিটায়ার' করিয়াছে। কিন্তু তিনি বহুকাল পূর্ব্বে সেই যে ভীমের বক্তৃতা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আজও সেই বক্তৃতাই করিতেছেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কত পারিবারিক শোক-দুঃখ, ঝড়-ঝঞ্ঝা গিয়াছে, কিন্তু একটি দিনের তরেও যাত্রার বৈঠকে অনুপস্থিত হন নাই। এই ব্যাপারে তাঁহার নিজের অপরিসীম সখ তো আছেই, তা ছাড়াও কয়েকটি অপরিহার্য্য কারণ আছে।

প্রথমতঃ ভীম অথবা এই প্রকারের বীর-রসের বক্তৃতা করিবার মতো চেহারাও কাহারও নাই, কণ্ঠস্বরও কাহারও নাই। দ্বিতীয়তঃ যাত্রার দলে অভিনয় করিবার সখ হয়তো আরও অনেকের ষোলো

আনার উপর আঠারো আনাই আছে, কিন্তু অন্যান্য তাল সামলাইবার শক্তি নাই। প্রতিদিনের বৈঠকে আলোয় তেল পোরা হইতে আরম্ভ করিয়া গাইয়ে ছোকরাদের জনে জনে বাড়ী বাড়ী গিয়া কত খোসামোদ করিয়া ডাকিয়া আনা আছে। বৈঠকের জন্য বাদ্যযন্ত্র বাহির করিয়া দেওয়া আছে। খাতায় খাতায় প্রত্যেকের পার্ট লিখিয়া দেওয়া আছে। ইহার উপর আরও একটা ব্যাপার আছে যাহা নহিলে দলের অস্তিত্বই থাকিত না। অভিনয় শেষ হইয়া গেলে সকলেই সাজ-পোষাক ফেলিয়া যে যাহার গৃহে সরিয়া পড়ে। কিন্তু অত রাত্রেও মৃত্যুঞ্জয় সাজ পোষাক না গোছাইয়া বাড়ী যাইতে পারেন না। পরের দিন সকালে সমস্ত পোষাক, চুল, দাড়ি রৌদ্রে দিয়া এবং পোষাকের ছিন্ন স্থান সংস্কার করিয়া আবার পর বৎসরের অভিনয়ের জন্য সমস্ত ঠিক করিয়া তাঁহাকেই বাক্সবন্দী করিয়া রাখিতে হয়। এ সমস্ত দুরূহ কাজ করিবার যোগ্যতাও কাহারও নাই, সে ধৈর্য্যও নাই।

সৌভাগ্যের বিষয় দলটি সখের। অভিনয় হয় বৎসরে একবার পূজার সময়। নহিলে মৃত্যুঞ্জয়ের আর বীণাপাণি নাট্যসমাজের বোঝা বহিয়া গৃহকর্ম্মের অবসর মিলিত না।

কিন্তু গত কয়েক বৎসর ফশলের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় অভিনয় করিবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। এবারে ফশলের অবস্থা আশাপ্রদ। সুতরাং আবার উৎসাহ ফিরিয়া আসিয়াছে। সম্মুখে পূজা, বোধ হয় তাহারই আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু আমার কাছে কেন? আমি নাট্যসমাজের অভিনেতা নই, সদস্যও নই। কখনও সামান্য কিছু চাঁদা দিয়াছি মাত্র।

মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, তোমার কাছেই এলাম বাবাজি।

—আসুন, আসুন। কী ব্যাপার!

—অবশেষে 'রাবণ বধ' আর 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর'ই ঠিক হ'ল।

কথাটা এমন ভাবে বলিলেন যেন এই সংবাদটা জানিবার জন্য আমি এই কয় রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারি নাই। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

মৃত্যুঞ্জয় হাসিযা বলিলেন, তোমাকে বাবাজি একটি কাজ করতে হবে।

কথার ভঙ্গীতে আশঙ্কিত হইলাম। সভয়ে বলিলাম, আমি কিন্তু পার্ট নিতে পাবব না।

আমার ভয় দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, না না। সে সব কিছু নয়। কোন পার্ট কাকে দেওয়া হবে তাই নিয়ে আমাদের মধ্যে বেধেছে গোলযোগ। কালকের মিটিঙে স্থির হয়েছে তৃতীয় পক্ষের ওপর ভার দেওয়া হোক। সকলে তোমার ওপর এই ভার দিতে চায়।

বুঝিলাম কমিটি মিটিঙ আব ভোট একেবারে দেশের মজ্জায় গিয়া মিশিয়াছে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের যাত্রার দলের ব্যাপার আমি বিলক্ষণ জানি। ইঁহাদের অনুরোধে আমি কাতরভাবে হাত জোড় করিয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম।

কিন্তু বীণাপাণি নাট্যসমাজের সদস্যগণ আমার অসম্মতি কাণেই তুলিলেন না। তাঁহারা এক সঙ্গে কলরব করিয়া উঠিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় আমার হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন, এটুকু ঝামেলা তুমি না পোয়ালে আমাদের আর পূজোয় গান করা হয় না।

সে একটা মস্ত বড় জাতীয় ক্ষতি সন্দেহ নাই। কি করা যায় ভাবিতে লাগিলাম। এ একটা মন্দ চাকুরী জুটিল না!

আমাকে চিন্তিত দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় আবার বলিলেন, কে কি রকম পার্ট করে তোমার তো সবই জানা। এই আমাদের মেম্বারদের লিষ্টি। কার কোন পার্ট পাশে পাশে বসিয়ে দিতে তিন মিনিটের বেশী লাগবে না। কেবল বই দুখানি একবার পড়ে নেওয়া।

সদস্যগণ সমস্বরে বলিলেন বাস্!

আজ পর্য্যন্ত নানা কাজে এত বেশী সময় অপব্যয় করিয়াছি যে তাহাতে আর তিন মিনিট যোগ দিতে আমার কুণ্ঠিত হওয়ার কারণ নাই। শুনিয়াছি আমার চেয়ে বড় বড় লোক কাজ না থাকিলে খুড়ার গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করেন। এ কাজ তাহার চেয়ে নিশ্চয়ই সহজ। বিশেষ বীণাপাণি নাট্যসমাজের উৎসাহী সদস্যগণ আমাকে আর ভাবিবারও অবকাশ দিলেন না। এক প্রকার জোর করিয়াই আমার সম্মতি আদায় করিলেন।

অবশেষে আমি বলিলাম, দেখুন আমি রাজি হচ্ছি। কিন্তু একটা সর্ত্তে। আমি যে পার্ট যাকে দোব বিনা প্রতিবাদে সেই পার্ট তাঁকে নিতে হবে। এই কথা দিন।

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সকলে কলরব করিয়া সে প্রতিশ্রুতি দিলেন। মৃত্যুঞ্জয় নাটক দুইখানি এবং মেম্বারের লিষ্ট আমার কাছে রাখিয়া সদলবলে চলিয়া গেলেন।

নাটক দুইখানিই উপাদেয়। হরিহরপুরের মেলায় কলিকাতার একটি বড় দলে এই দুইখানির অভিনয় দেখিয়া পাষাণও কাঁদিয়া গলিয়া গিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের গানের সখ জগদ্বিখ্যাত। তিনিও দর্শক দলের মধ্যে ছিলেন। তখনই তাঁহার নিজের দলে নাটক দুইখানির অভিনয় করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পড়িতে পড়িতে আমিও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু সে অশ্রু হরিহরপুরের মেলায় মৃত্যুঞ্জয় প্রমুখ বিশিষ্ট দর্শকবৃন্দের জন্য কিম্বা নাট্যকারের জন্য তাহা সঠিক বলিতে পারিব না।

'রাবণবধের' মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রায় সমগ্র অংশই আছে। অন্ধ মুনির অভিশাপ হইতে রাবণ বধ পর্য্যন্ত কোনো ঘটনাই বাদ যায় নাই। তাহার মধ্যে কি আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত কয়েক জন ঔদরিক ব্রাহ্মণও আমদানি করিয়া একপ্রকার হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা আর এখন ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না। উপসংহারে লক্ষ্মী নারায়ণ বৈকুণ্ঠে একখানি চেয়ারে ঘেঁষা-ঘেঁষি করিয়া বসিয়া আছেন। সখীগণ নৃত্যগীত করিতেছেন। তাহারই মধ্যে রাবণ এবং নারদ মুনি দাঁড়াইয়া।

'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর'ও ইহার চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। কুশীলব দৃষ্টে বুঝিলাম স্বর্গের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া মর্ত্ত্যের কুরুবংশ যদুবংশ এবং দ্রুপদ পরিবারের কাহাকেও নাট্যকার বিস্মৃত হন নাই। বিশেষ ভীমসেন থাকিতে এ পালা না জমিবার কোনই

আশঙ্কা নাই। এবং আমাদের মৃত্যুঞ্জয়ের ভীমসেন একটা দেখিবার জিনিস। একা তিনিই আসর মাত করিবেন।

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আমার একটু তন্দ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। সংবাদ আসিল মৃত্যুঞ্জয় ডাকিতেছেন। অন্য কেহ হইলে ফিরাইয়া দিতাম। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় আমার পিতৃবন্ধু। তাঁহার আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। নামিয়া আসিতে হইল। দেখি, ভদ্রলোক একটি ছাতা বগলে বৈঠকখানার সম্মুখের উঠানে দাঁড়াইয়া আছেন।

প্রথমেই কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিলেন, এইখানে একটা আউশের জমিতে ধান কাটা হচ্ছে তাই দেখতে এসেছিলাম। ভাবলাম একবার তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাই।

—উঠে বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

—না, আর বসব না। কেমন লাগছে বই দু'খানা?

—চমৎকার!

—ভীমের বক্তৃতা জমবে তো? কি মনে হচ্ছে?

বুঝিলাম ভীমের পার্ট যে তিনি স্বয়ং লইবেন তাহা স্থির হইয়াই আছে। বলিলাম, ভীমেরই তো বক্তৃতা! দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের জন্য তো ভাবছি না। ও তো আপনি একাই জমিয়ে রাখবেন। কিন্তু...

মৃত্যুঞ্জয় একেবারে কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন, রাবণের পার্টও আমাকেই করতে হবে। দুটো বড় পার্ট মুখস্থ করতে কষ্ট হবে বটে কিন্তু উপায় কি? আর লোক কই? আর শোনো মেঘনাদের পার্টটা কেষ্টকেই দিও। বড্ড ধরেছে। আমার ছেলে

ব'লে বলছি না, ছোকরা বীররসের পার্ট খুব ভালই করে। আর একটা কথা। অহিরাবণের পার্টটা অহিভূষণকে দিতেই হবে।

বলিলাম, তা মন্দ হবে না। নামে নামে মিল হবে। কিন্তু ও চিরকাল মন্ত্রীর পার্ট ক'রে এসেছে। এসব বীররসের ··

—শিখিয়ে নিতে হবে। তাছাড়া একটা বীরের পোষাকের জন্যে পঁচিশ টাকা দিচ্ছে। আমাদের পাড়াগাঁয়ের দল। ওই রকম ক'রেই···বুঝলে না?

বুঝিলাম। এখন বাকি কয়টা পার্টের ব্যবস্থা হইয়া গেলেই আমার কাজ সত্য সত্যই তিন মিনিটে সমাধা হইয়া যায। জিজ্ঞাসা করিলাম, রাম আর লক্ষ্মণ?

মৃত্যুঞ্জয় হাসিয়া বলিলেন, আমাদের মধ্যম আর ছোট জনাকে দিতে হবে। ও করুণ রসের পার্ট আর কেউ পারবে না।

মধ্যম আর ছোট জনা মৃত্যুঞ্জয়ের দুই সহোদর।

—হনুমান?

—ওই খানেই বেধেছে গোলযোগ। তারাকিঙ্কর বলছে সে নেবে, আর ইন্দ্রনাথ বলছে সে নেবে। দিও যাকে হয।

বুঝিলাম হনুমান সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের বিশেষ উৎসাহ নাই, সুপারিশও নাই। নিজের দুই ভায়ের এবং পুত্রের ব্যবস্থা করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ভাবে ছাতাটা মেলিলেন। বলিয়া গেলেন, অন্য কাহারও কোনো কথা শুনিবার প্রয়োজন নাই। আমি নিজে যাহা ভালো বুঝিব তাহাই যেন করি। এ বিষয়ে আমার মতামতই চূড়ান্ত।

মৃত্যুঞ্জয়কে বিদায় করিয়া আমি নিশ্চিন্তভাবে আসিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। এমন সময় আমার জানালার নীচে

দাঁড়াইয়া তারাকিঙ্কর ডাকাডাকি করিতে লাগিল। সে আমারই সমবয়সী এবং বাল্যকালের সহপাঠী। তাহার ডাকে আর সাড়া দিলাম না। কিন্তু বেশীক্ষণ সাড়া না দিয়াও পারিলাম না। চীৎকারে সে পাড়া মাথায় তুলিল। বাধ্য হইয়া নীচে নামিয়া আসিলাম।

ভাবিয়াছিলাম তাহাকে কয়টা কড়া কথা বলিব। কিন্তু আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বে সেই আমাকে ধমক দিয়া দিল, যা হোক বাবা! ঘুম বটে! আশ্বিন মাসের দিনের বেলাতেও ঘুমুতে ইচ্ছে হয়! আশ্চর্য্য! তাতেই তোমার শরীরের ওই অবস্থা!

বলিলাম, খুব সম্ভব। কিন্তু তোমার প্রয়োজনটা কি চট পট ব'লে যাও দেখি!

একটা হাত বুকে রাখিয়া এবং অপর হস্ত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া তারাকিঙ্কর সুর করিয়া বলিল,

প্রয়োজন? বলি কারে? কে বুঝিবে
দগ্ধ এই মরমের ব্যথা? কে শুনিবে···

বলিলাম, চমৎকার! তারপর?

আমার কাঁধে একটি ঝাঁকি দিয়া তারাকিঙ্কর বলিল, বাওয়া, সেই যে সেনাপতির পার্ট আরম্ভ হয়েছে তার আর প্রমোশন হ'ল না। এবারে বড় কিছু চাই তা ব'লে দিচ্ছি।

—কি রকম বড়?

—রাজা। বাওয়া, চাঁদার বেলা সমান-সমান পার্টের বেলায় হুঁ হুঁ?

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রকম রাজা? যুধিষ্টির? দুর্য্যোধন? দ্রুপদ?

—ওতে নয় হে, 'রাবণ বধে'।

—দশরথ? বালী?

—রাবণ হে রাবণ। শোন বলি। হনুমানের পার্ট নিয়ে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে লেগেছিল ঝগড়া। তার সঙ্গে আপোষ হয়েছে। হনুমান সেই করবে, কিন্তু রাবণ আমার চাই।

বলিয়া হাতে একটা তালি বাজাইল।

বলিলাম, সে কি করে হয়? মৃত্যুঞ্জয়…

মৃত্যুঞ্জয় চিরকালই বড় পার্ট করবে? আর আমরা বুঝি বানে ভেসে এসেছি!

আমাকে চিন্তিত দেখিয়া তারাকিঙ্কর আবার বলিল, তুমি আমার পার্ট একদিন শোনো। তারপর বোলো।

মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, শুনেছি।

—এখনকার বক্তৃতা শুনেছ? অবিকল বড়দলের মতো।

জীবনকালী আসিয়া নিঃশব্দে তাহার পাশে দাঁড়াইল। তারাকিঙ্কর বলিল, বিশ্বাস না হয় একে জিগ্যেস কর।

জীবনকালী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বটে।

তারাকিঙ্কর মাথা নাড়িয়া বলিল, আর এই যে জীবনকালী। আজীবন সহকারী সেনাপতির পার্ট ক'রে এল। কেন, মেঘনাদের পার্ট ওকে দেওয়া যায় না? কেষ্টই বা এমন কি ভালো করে? তবু যদি প্রত্যুম্নকে প্রদ্যুম্ন না বলত! জীবনকালী যত খারাপই করুক তা তো আর বলে না! তোমার সেই পার্টটা শুনিয়ে দাও তো হে,—'ওহে হরি, বংশীধারী…'

জীবনকালী গড় গড় করিয়া মুখস্থ বলিয়া যাইতে লাগিল।

সুবিধা এই যে, কমা পূর্ণচ্ছেদের উপর তাহার কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। সেজন্য অচিরেই শেষ হইয়া গেল।

তারাকিঙ্কর হাসিয়া বলিল, শুনলে? নিতান্ত মন্দ বলে না। কিন্তু আমাদের মত বেশী চাঁদা দিতে পারে না ব'লে কেউ আর গেরাহ্যিও করে না, ভালো পার্টও দেয় না।

বলিয়া সে জীবনকালীর দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার ওই 'হরি' আর 'বংশীধারীর' ওপর টানটা ঠিক হয় না। এই রকম হবে।

তারাকিঙ্কর টানটা যে ভাবে দেখাইয়া দিল তাহা একেবারে আমার নাড়ীতে গিয়ে নাড়া দিল। তারপর গম্ভীরভাবে বলিল, মেঘনাদের পার্টটা আমার কাছে গিয়ে দু'দিন দেখিয়ে নেবে, ঠিক হয়ে যাবে।

এমন সময় লাঠিতে ভর দিয়া রামেশ্বরী বুড়ী আসিয়া ঘোলাটে দৃষ্টি দিয়া আমাদের সকলের মুখ অসীম বিরক্তি সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বলিলাম, কি গো পিসী?

বলামাত্র পিসী ভাঙা কাঁসরের মতো বাজিযা উঠিল। বলিল, মুখপোড়া যাত্তারার পাট করছে কে গো? তুমি?

আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তারাকিঙ্কর বলিল, হাঁ গো। কেন? তুমি পার্ট নেবে নাকি দিদিমা?

—তোর পাটে আমি নুড়ো জ্বেলে দি। (আমাকে বলিল) তা হ্যাঁ গা, তোমার আক্কেল কি বল দেখি? আমার দুধের বালক গোপাল, সমস্ত দিন কিছু খায়নি। আমি টাকা কোথা পাব?

ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিতভাবে তারাকিঙ্করের দিকে চাহিলাম। তারাকিঙ্কর মুচকিয়া হাসিল। বলিল, দিদিমা, সুদ খেয়ে খেয়ে এদিকে তো টাকার কুমীর হয়ে ব'সে আছ। নাতির একটা সখ না হয় মেটালে ?

—তোর চোখে আগুন লাগুক মুখপোড়া ! আমার বড় টাকা দেখেছিস, না ? তুই দে কেন পাঁচ টাকা।

—আমি তো দিয়েছি।

—হ্যাঁ, দেয় অমন সবাই। দানছত্র খুলে বসেছিস !

—জিগ্যেস কর না কেন ? তোমার মতো তো নই। সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটি মাত্র নাতি। তা সারাদিন না খেয়ে সে প'ড়ে আছে, তবু প্রাণ ধ'রে পাঁচটা টাকা আর বার ক'রতে পারছ না। হাত্তেরি ভালা হোক !

—থাম, থাম। বেশী ফট ফট করিস না।

রামেশ্বরী অতি সন্তর্পণে আপনার মলিন বস্ত্রপ্রান্তের গিঁট খুলিয়া একটি টাকা বাহির করিল। টাকাটা দিতে তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। বেচারী পাড়ার লোকের ধান ভানিয়া মুড়ি ভাজিয়া ঘুঁটে বিক্রী করিয়া এবং এই প্রকার পাঁচ রকমে প্রাপ্ত টাকা সুদে খাটাইয়া দুই পয়সা করিয়াছে। কেহ বলে বেশ দুই পয়সা, কেহ বলে তেমন কিছু নয়। এই ভাবে বহু কষ্টে সঞ্চিত অর্থের মধ্য হইতে একটি টাকা দিতে তাহার হাত কাঁপিতেছিল। তাহা দেখিয়াও তারাকিঙ্করের কিছু মাত্র দয়া হইল না।

বলিল, একটা টাকা কি দিচ্ছ দিদিমা ! একটা টাকায় তামাক সাজার পার্ট দোব।

রামেশ্বরী টাকাটা আমার হাতে দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া বলিল, মুখপোড়া! আমার সব কাজে তুই বাগড়া দিতে আসিস কেন রে? এত লোকের গরু-ভেড়া মরে, তোমার মরণ নেই?

তখনই গলা নামাইয়া কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া আমাকে বলিল, এই টাকাটা নাও বাবা। মাইরি বলছি, আর একটি তামাও আমার হাতে নেই। আর আমার গোপালকে একটা ভালো পার্ট দিও। আমার বাপ মা মরা ছেলে! কখনও···

কান্নায় তাহার স্বর ভাঙিয়া পড়িল।

বলিলাম, আমাকে কেন দিচ্ছ পিসী! আমি তো ওদের দলের কেউ নই। তুমি মৃত্যুঞ্জয় খুড়ার কাছে যাও। সেই কর্তা।

তারাকিঙ্কর রামেশ্বরীকে বড় জ্বালায়। হাসিয়া বলিল, সেখান থেকে ঘুরে আসা হয়েছে যে। একটা টাকা নেবার কি উপায় আছে?

—এসেছে ঘুরে মুখপোড়া! তুই মানুষের পেটের খবর রাখিস কিনা। না বাবা, কোথাও যাইনি। আমার কাছে সবাই সমান বাবা, তুমিও যা মিতুনও তাই।

রামেশ্বরী টাকাটা আবার দিতে আসিল।

তাহাকে কিছুতে বোঝাইতে পারি না যে, আমি যাত্রার দলের কেহ নই। বোধ হয় তারাকিঙ্করের অনুমানই ঠিক। মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে সুবিধা না হওয়ায় আমাকে আসিয়া পাকড়াইয়াছে। এত কাণ্ডও করিত না। কেবল গোপালচন্দ্র আহার ত্যাগ করাতেই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। আমি যত টাকা লইতে অসম্মতি জানাই, সে ততই কাঁদে। অবশেষে আমি কিছুতেই টাকা লইতেছি না

দেখিয়া বাঁ দিকের ট্যাঁক হইতে আর একটা সিকি বাহির করিল। এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার দিব্য করিয়া জানাইল আর যদি একটি পয়সাও তাহার কাছে থাকে।

আমি অন্যমনস্কভাবে গোপালের কথা ভাবিতেছিলাম। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ার জন্যই হউক, অথবা তাহার মুখের গড়নই ওইরূপ হওয়ার জন্যই হউক, সব সময় যেন সে কুণ্ঠিত করুণ মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। আইনত সাবালক হইলেও পিতামহীর আওতায় এখনও সে যথার্থ সাবালক হইতে পারে নাই, দুধের গোপালই আছে। মুখচোরা লাজুক ছেলে। কাহাকেও জোর করিয়া কিছু বলিতে পারে না। তাই পিতামহীর কাছে বায়না ধরিয়াছে এবং অন্নজল ত্যাগ করিয়া তাহার কাছ হইতে টাকা বাহির করিবার একমাত্র অব্যর্থ পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। ফলে বিব্রত হইয়া রামেশ্বরী পাঁচজনের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রামেশ্বরী কোথা হইতে আরও দুইটা পয়সা বাহির করিয়া একেবারে আমার হাত চাপিয়া ধরিল।

তারাকিঙ্কর হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, একি আলু পটল পেয়েছ দিদিমা, যে দর করছ? পাঁচটা টাকা ধরা হয়েছে, চা'র টাকার কমে কিছুতে হবে না।

এবার আর রামেশ্বরী তাহাকে গালাগালি দিল না। পেট-কাপড় হইতে আরও একটা টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল। তারাকিঙ্কর গণিয়া দেখিল দুই টাকা সাড়ে চারি

আনা। হাসিয়া বলিল, এ যে ভাঙা-ভর্ত্তি হ'ল দিদিমা? টাকা পুজিয়ে তো দাও।

—মাইরি দিব্যি করলাম তবু বিশ্বেস হ'ল না?

—অন্তত আর সাড়ে তিন আনা দিয়ে আধুলিটে ভর্ত্তি ক'রে দাও।

রামেশ্বরী কিছুতেই দিবে না। বহু টানাটানিতে দুই পয়সার চাল দিতে রাজী হইল। যাওয়ার সময় বার বার বলিয়া গেল একটা ভালো পাট যেন গোপালকে দেওয়া হয়।

সকলে চলিয়া যাওয়ার পর মনটা খারাপ হইয়া গেল। এই হাঙ্গামের মধ্যে থাকা ঠিক নয়। বিকালের দিকে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীর দিকে গেলাম, বই দুইখানি এবং মেম্বারের লিষ্টি ফেরত দিবার জন্য। দেখা পাইলাম না। সেখান হইতে তারাকিঙ্করের বাড়ী গেলাম। বাহির হইতেই তাহার উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। ভিতরে গিয়া দেখি, সে গোয়ালঘরের সম্মুখে উঠানে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া এবং দাঁতমুখ খিঁচাইয়া দুঃশাসনের রক্তপান করিতেছে। একপাশে গোপাল খড়কাটা বন্ধ রাখিয়া বিস্মিত বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার 'পস্‌চার' এবং অভিনয়-নৈপুণ্য দর্শন করিতেছে। অপরদিকে গরুগুলি সভয়ে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। খোঁটায় শক্ত করিয়া বাঁধা, পালাইবার উপায় নাই।

আমাকে দেখিয়া তারাকিঙ্কর রক্তপান বন্ধ রাখিয়া সুহাস্যে

বলিল, গোপালকে শেখাচ্ছিলাম। বড় ভালো ছেলে। পারবে। বুঝলে? ওকে অন্তত দণ্ডকারণ্যের বক্তৃতাটাও দিতে হবে।

তারাকিঙ্কর দুই পংক্তি দন্ত বাহির করিয়া কৌতুকভরে হাসিয়া উঠিল। গোপালকে বলিল, নে বাপু, এই ক'টা গরুর খড় কাটা তোর এখনও হ'ল না? তুই কি রে! এমনি ক'রে পার্ট করবি?

গোপাল খুব জোরে জোরে মশ্ মশ্ করিয়া খড় কাটিতে লাগিল।

তারাকিঙ্কর বলিল, এ ক'দিন আমার রাখাল নেই বাপু। তার অসুখ ক'রেছে। তোকে বাপু একবার ক'রে রোজ আসতে হবে!

গোপাল সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

আমি তারাকিঙ্করের দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া তারাকিঙ্কর এমন ভাবে হাসিয়া উঠিল যে, তাহার অর্থ বুঝিয়া গোপাল লজ্জায় মাথা নীচু করিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। বই দুইখানি এবং মেম্বারের লিষ্ট তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা পেলাম না। তুমিই রাখ। এসব আমার পোষাবে না।

বলিয়া আর এক মিনিটও না দাঁড়াইয়া চলিয়া আসিলাম।

গোমস্তা মশাই

স্নান করিতে গিয়া দীঘির বুড়া বটগাছের শিকড়ের উপর স্নিগ্ধ ছায়ায় আমরা কয়জন বসিয়া আছি। আমি, শ্যামাপদ ডাক্তার, হেমাঙ্গ মিত্র, রমণী দাস এবং আরও একজন, কে ঠিক স্মরণ হইতেছে না। সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ শূন্য মাঠ জ্যৈষ্ঠের তপ্ত রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। সেদিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে চোখ জ্বালা করে। গল্প হইতেছিল বাল্যকালের সুখস্মৃতিবিজড়িত দিনগুলির। হঠাৎ শ্যামাপদ ডাক্তার দূরে কাকে দেখিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, এই যে! আসছে।

মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি একটা লোক মাথা দোলাইতে দোলাইতে হন হন করিয়া আগাইয়া আসিতেছে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। এই খররৌদ্রেও তাহার মাথায় একখানা মাত্র গামছা। ভিজা কি না জানি না। মাথায় চাপানর সময় ভিজা থাকিলেও এতক্ষণ শুকাইয়া গিয়া থাকিবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কে ও?

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিল, গয়ানাথ মণ্ডল। নয়নজলী বাড়ী।

নয়নজলী সম্মুখের গ্রামটি। আধ মাইলটেক দূরে। খুবই ছোট গ্রাম। কয়েকঘর বাগ্‌দী, একঘর ডোম এবং বাকি ঘর-বিশেক সদ্‌গোপ। ইহারা সকলেই চাষী। কাহারও দুই চারি বিঘা করিয়া জমি আছে, কাহারও তাহা নাই। সাধারণতঃ, আমাদের গ্রামের পূবে যে মাঠ আছে, সেই মাঠের জমি ভাগে চাষ করিয়া খায়। নয়নজলীর সঙ্গে আমাদের গ্রামের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। দোকান-হাট করিতে এবং আরও অনেক বিষয়েই দরকার

পড়িলে উহাদের এ গ্রামে আসিতে হয়। বিনা দরকারেও যে যাতায়াত করে না, এমন নয়।

গয়ানাথ হন হন করিয়া সোজা আমাদের কাছে আসিয়া থামিল। ডাক্তারকে দণ্ডবৎ নমস্কার করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে সে একগাল হাসিল।

গয়ানাথের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। রুগ্ন লম্বা দেহ। তলতা বাঁশের মত সোজা। আকাশের দিকে চাহিয়া শীর্ণ দেহটি টান করিয়া সে এমন ভাবে সমস্ত শরীরের একটা খাপছাড়া আড়ষ্টভাব বজায় রাখিয়া হন হন করিয়া হাঁটে যে, মনে হয় হাঁটিবার জন্য শরীরের যে গাঁটগুলি লাগে, সেগুলি ঠিক আছে, কিন্তু বাকি-গুলিতে মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। মাথার কাঁচা-পাকা চুলগুলি ছোট ছোট করিয়া ছাঁটায় সজারুর কাঁটার মতো খোঁচা-খোঁচা হইয়া আছে। রগের কাছে চুল না থাকার জন্য দুইটি উপসাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। মুখখানি ডিমের মত লম্বাটে। আবক্ষলম্বিত পাকা দাড়ি এবং গোঁফ, চোখ ভাসা ভাসা, নাকটি খাঁদা এবং কান দুটি অস্বাভাবিক লম্বা। মুখের হাঁ বড়।

গয়ানাথকে দেখিলেই, বিচার করিয়া দেখিবার আগেই, বুঝিতে পারা যায় যে, লোকটির মনের মধ্যে কোথাও কোনো রকম মারপ্যাচ নাই।

ডাক্তার তাহাকে দেখিবামাত্র বলিল, তোমাকেই খুঁজেছিলাম, গয়ানাথ। লোক গিয়েছিল তোমার কাছে?

আগ্রহে গয়ানাথের মাথাটা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া আসিল

এবং বিচলিত ভারকেন্দ্র স্থির করিবার জন্য হাত দুইটি পিছনের দিকে পরস্পর যুক্ত হইল।

গয়ানাথ সোৎসুকে বলিল, কই আমার সঙ্গে দেখা হয়নি তো?

—সে কি! আমি নিজে লোক পাঠিয়ে দিয়ে এলাম।

গয়ানাথ পিছনের দিকে চঞ্চল ভাবে চাহিল। যদি লোকটাকে দেখা যায়। বলিল, তা' হলে বোধ হয়···আমি তো ভোরেই লাঙল নিয়ে বেরিয়েছি।

—তা-ই হবে। গিয়ে ফিরে এসেছে।

গয়ানাথ চোখে একটা কটাক্ষ হানিয়া বলিল, ঠিক হ'য়ে গেল না কি?

—হবে না? আমি নিজে গিয়েছিলাম যে। বাহালি পরওয়ানা লিখিয়ে সই করিয়ে, লোক পাঠিয়ে দিয়ে এই তো ফিরলাম। তবে, ঐ যা বলেছি নজরের টাকাটা।

মাথাটাকে তেরছা করিয়া খুব ভারিক্কি চালে গয়ানাথ জিজ্ঞাসা করিল, কিছু কম হ'ল না?

—ওর চেয়ে কমে আর হয়, হ্যাঁ গয়ানাথ? মাহালের আদায়টা কত হিসাব কর। পঁচিশ টাকার কমে হয়?

—তা বটে।

—তা কুড়িটা টাকা তো আমিই ধার ক'রে, স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়ে, জোগাড় ক'রে দিলাম। বাকি পাঁচটা টাকা···তা তুমি একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক—

গয়ানাথ করুণভাবে বলিল, আমার কাছে নেই। দুটি টাকার

লাঙল বিক্রি ক'রেছিলাম। একটি টাকার চাল কিনেছি, আর একটি টাকা আছে।

ডাক্তার সোৎসাহে বলিল, একটা আছে তো? তা হ'লে আর চারটে টাকা। এই চারটে টাকা তোমাকে দিতে হবে মনোহর।

বলিয়া আমার দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে গয়ানাথ নিজেও হাত জোড় করিয়া করুণ মিনতি জানাইল।

বলিল, বাবু মশায়, আমাকে আপনি চেনেন না। কিন্তু এনারা জানেন। লোক আমি মন্দ নই। টাকা যদি আপনার নাও দিতে পারি, শাকে মাছে পুষিয়ে দেব।

বলিয়া সমর্থনের জন্য ডাক্তারের দিকে চাহিল।

ডাক্তার আমার সম্মতির অপেক্ষাও করিল না। ডান হাত নাড়িয়া তাহার দুশ্চিন্তা যেন ঢেউ দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিল, আর বলতে হবে না। উনি অতি সজ্জন ব্যক্তি, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি এখন যাও, বিকেলে এস।

বলিয়া হাসিমুখে যোগ দিল, তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। নইলে আমাকেই আবার বিকেলে লোক পাঠাতে হত।

এক গাল হাসিয়া গয়ানাথ বলিল, আমি ঐ জোড়পুকুরের নীচে লাঙল দিচ্ছিলাম। আপনাকে দেখেই ছুটে এলাম।

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিল, বলদ কোথায় রেখে এলে?

তাহার আশঙ্কা হইয়াছিল, গয়ানাথ বুঝি বলদদুটিকে মাঠেই রাখিয়া আসিয়াছে। অসহায় পশু দুইটি লাঙল ঘাড়ে করিয়া এই কাঠফাটা রোদে শূন্য মাঠে ঠায় দাঁড়াইয়া আছে।

কিন্তু ডাক্তারের ব্যস্ততায় গয়ানাথ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া নিস্পৃহভাবে বলিল, গাছে বেঁধে রেখে এসেছি। কিন্তু বাহালি পরওয়ানা…

—সব ঠিক আছে। তুমি এখন যাও, গয়ানাথ। ঠিক বিকেলে আসবে। নিজে সঙ্গে করে বাবুদের কাছে নিয়ে যাব।

গয়ানাথের এত শীঘ্র যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বোধ হয় বলদ দুইটির চিন্তায় ডাক্তার আর তাহাকে বসিতে দিল না। জোর করিয়াই বিদায় করিল। যাইতে কি সে চায়? একবার করিয়া যায়, আর কি কথা মনে পড়ায় ফিরিয়া আসে। বহু কষ্টেই সে বিদায় লইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কি?

ডাক্তার ব্যাপারটা বলিল। নযনজলী গ্রামখানি হাঁসপুকুরের বাবুদের জমীদারী। গয়ানাথ সেই মহালের গোমস্তাপদপ্রার্থী। আর ডাক্তার তাহার মুরুব্বি।

বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কি লেখাপড়া জানে?

—জানে। কেবল 'শ্রী'টা লিখতে পারে না। আর, 'ও'র বদলে 'ও' লেখে।

হাসিয়া বলিলাম, তা হ'লে?

—তা হোক। ও বলছে, পারবে।

ব্যাপারটা বুঝিলাম। বলিলাম, কেন বেচারাকে পাগল করছ? তোমার এই এক রোগ।

ডাক্তার হাসিয়া বলিল, পাগল? ও তো পাগল হয়েছেই। এইবার আমি পাগল হব, আর দিন কয়েক থাকলে তোমাকেও হতে হবে।

কথাটা তখন হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু সেই দিন অপরাহ্ণেই তাহার সত্যতা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিলাম। তখনও তিনটা বাজে নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর বলিলেই হয়। ঘরের ভিতর শুইয়া ছটফট করিতেছি। খবর আসিল, একটি লোক দেখা করিতে চায়।

বাহিরে আসিয়া দেখি, গয়ানাথ! একটা তালের ছাতা মাথায় দিয়া নিমতলায় দাঁড়াইয়া নতমুখে কি যেন গভীর চিন্তা করিতেছে। রৌদ্রে হাঁটিয়া আসায় মুখ রক্তবর্ণ। সর্ব্বাঙ্গ গলদ্‌ঘর্ম্ম। তাহার উপর বাবুদের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে বলিয়া গায়ে একটা অত্যন্ত মলিন পাঞ্জাবীও চড়াইয়াছে। ঘামে ভিজিয়া সেটি গায়ের সঙ্গে একেবারে ল্যাপ্টাইয়া গিয়াছে।

আমার পদশব্দে মুখ তুলিয়াই বলিল, সেই টাকা পাঁচটা দিন।

মন্দ নয়। হাসি চাপিয়া বলিলাম, এখনি?

গয়ানাথ তাড়াতাড়ি বলিল, হ্যাঁ মশাই, এখনি। ও একেবারে মিটিয়ে ফেলাই ভাল। এখনি কত লোক ভ্যাঙচি দেবে তার ঠিক আছে! আজই ডাক্তারবাবু আমাকে নিয়ে বাবুদের কাছারী যাবেন কি না!

উৎসাহে গয়ানাথ তালের ছাতাটা আকাশে তুলিল। আমি কি বলা যায়, ভাবিতে লাগিলাম।

গয়ানাথ আবার বলিল, এখন আমাকে সন্দ হচ্ছে, কিন্তু মাহালটা একবার হাতে আসতে দিন না, তারপর কি করি দেখবেন। ডাক্তারবাবুকে আর আপনাকে ভুলব না।

বলিলাম, সে কি আর জানি না, গয়ানাথ! নইলে কি আমিই পাঁচ পাঁচটা টাকা এক কথায় ফেলে দিই!

বলিয়াই বলিলাম, কিন্তু পাঁচটা টাকা ত দেবার কথা ছিল না, গয়ানাথ। আমি চারটে টাকা দোব।

গয়ানাথ হাত জোড় করিয়া বলিল, আজ্ঞে না, পাঁচটাই দিতে হবে। বাড়ী গিয়ে দেখি, সে টাকাটারও কিছু ভাঙা হয়ে গিয়েছে।

বিষণ্নমুখে বলিলাম, পাঁচটি টাকা তো নেই গয়ানাথ। চারটিই আছে। তুমি আর একটি টাকার ব্যবস্থা ক'রে আমার কাছে এসো। আমার টাকাটার জন্য ভাবনা নেই।

গয়ানাথ যেন একহাত মাটির নীচে বসিয়া গেল। পাংশু মুখে বলিল, আর একটি টাকা কোথায় পাই?

বলিলাম, আমার কাছে আর নেই গয়ানাথ। থাকলে, চারটে টাকা দিতে পারলাম, আর একটা টাকা দিতে পারতাম না?

—তা বটে! বলিয়া সে ইতস্তত চাহিল।

—সামান্য একটা ত টাকা। ডাক্তারবাবুর কাছেই পাবে নিশ্চয়।

—তা পাব। বলিয়া আর একবার ছাতাটা শূন্যে আস্ফালন করিয়া চলিয়া গেল।

একঘণ্টা পরে ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া আবার গয়ানাথ উপস্থিত। আমাকে দেখিয়া জেলের কয়েদীর মত ডাক্তার ম্লানভাবে হাসিল। তাকে দস্তুরমত বিব্রত বোধ হইল।

গয়ানাথ থপ করিয়া শূন্য মেঝেয় বসিয়া বলিল, এই নিন। বলিয়া সার্থকতার আনন্দে মাথা দোলাইতে লাগিল।

ডাক্তার আমার পাশে বসিয়া একটি আঙুল উঁচু করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, একটি টাকার জন্যে আটকাচ্ছে। তুমি তো জান স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়ে কুড়িটা টাকা অতি কষ্টে সংগ্রহ করেছি। এ টাকা তো জমিদারকে নজর দিতেই যাবে। তারপরে আমলা-ফয়লা আছে। পাঁচটি টাকার কমে কিছুতে হবে না। চারটি টাকা তুমি দিচ্ছ। আর একটি টাকা। কি বল গয়ানাথ?

গয়ানাথ মাথা দোলাইল।

বলিলাম, আমি তো সবই বলেছি ভাই।

বাধা দিয়া ডাক্তার বলিল, সে কি আর বুঝি না? তুমি অতি সজ্জন ব্যক্তি। আর গয়ানাথও একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক।

একটি টাকার জন্যে হাতের কাছে এসে কাজটি যাবে? হ্যাঁ, গয়ানাথ?

গয়ানাথ আবার মাথা দোলাইল।

—কি করা যায় বল?—আমি বলিলাম।

—সেই জন্যেই তো সব কাজ কামাই ক'রে তোমার কাছে এলাম মনোহর।

ডাক্তার মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া বলিল, আচ্ছা, তুমি যাও, গয়ানাথ। নিশ্চিন্ত থাক, আমরা যা হোক একটা কিছু করছি। কাল সকালে আর কাজ কামাই ক'রে আসতে হবে না। একেবারে বিকেলে সেজেগুজে এসো।

অনিচ্ছার সঙ্গে গয়ানাথ উঠিল। যাওয়ার সময় বার বার হাত জোড় করিয়া বলিয়া গেল, কাজটি যেন হাতছাড়া না হয়; এবং আশ্বাস দিয়া গেল, একবার কাজটি হইলে পুকুরের মাছ খাওয়াইয়া, ইত্যাদি।

ডাক্তারকে বলিলাম, কেন বাপু, ওকে মিথ্যে ভোগা দিচ্ছ? এখন চাষের সময়, কেনই বা ওর কাজ কামাই করাচ্ছ? এমনি কিছুদিন ছোটাছুটি করলে আসছে বছর ওকে উপোস করতে হবে।

ডাক্তার হাসিল।

বলিলাম, হাসির কথা নয়। এই একদিনেই আমার মাথা খারাপ হবার মতো হয়েছে। কাল আমি ওকে সব খোলসা ব'লে দোব।

—তা হ'লে তো বাঁচি। তিন মাস থেকে ওর উৎপাতে

আমার দিবানিদ্রা বন্ধ। আর কাজের যে কত ক্ষতি হচ্ছে তা ব'লে শেষ করা যায় না।

—তবে অমন ঘোরাচ্ছ কেন?

—আমি ঘোরাচ্ছি! ও-ই আমাদের ঘোরাচ্ছে দেখছ না? চুলোয় যাক। একটু চা খাওয়াও ভাই। আমি তৈরি চা ফেলে এসেছি।

পূর্ব্বমাঠে আমাদের একটা জমিতে লাঙল দিবার কথা ছিল। দেওয়া হইতেছে কি না দেখিতে গিয়াছিলাম। বাজপাখীর মত শোঁ করিয়া গয়ানাথ আসিয়া একটা দণ্ডবৎ করিয়া দাঁড়াইল। তার হাতে একটা পাঁচন।

চমকের ভাবটা কাটিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি খবর গয়ানাথ?

—সেই টাকাটা।—গয়ানাথ হাত চুলকাইতে লাগিল।

আমার জমিতে যাহারা চাষ দিতেছিল, তাহারা বিস্মিতভাবে চাহিল। বোধ হয় ভাবিল, কোনো কালে ইহার কাছে কিছু টাকা আমি ধার করিয়াছিলাম। বহুকাল পরে হঠাৎ দেখা পাইয়া চাহিতে আসিয়াছে। ইচ্ছা হইল, সকল কথা ইহাকে বলিয়া দিই। কিন্তু ইহার করুণ চোখে এবং সারল্যপূর্ণ ঠোঁটে কি যেন আছে। চঞ্চল চোখে চকমক করিয়া একবার আমার কর্ম্মরত লোকগুলির দিকে, একবার আমার দিকে চাহিতেছিল। উদ্বেগে এবং আগ্রহে প্রাণটুকু ঠোঁটের কাছে ধুকধুক করিতেছে।

বুঝিলাম, ডাক্তারের দোষ নাই। ইহাকে এখন নিরুৎসাহ করিবার রূঢ়তা মানুষের নাই।

বলিলাম, সে টাকা তো ডাক্তারকে কালই দিয়ে দিয়েছি।

আনন্দে গয়ানাথের মাথা তুলিয়া উঠিল। আমার সঙ্গে সঙ্গে সে অনেকটা পথ আসিল। অনেক কথা বলিবার বোধ হয় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কথাগুলা কি, খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

বলিলাম, তোমাকে আর আসতে হবে না। চাষ কর গে যাও। ডাক্তারবাবু যখন এর মধ্যে আছেন, তখন ভাবনা কিছু নেই।

গয়ানাথের চাষে মন বসিতেছে না। কাল কিংবা পরশু গোমস্তাগিরি হস্তগত হইলে আর কে চাষ করে! নিতান্ত বসিয়া আছে, তাই এই কয়টা দিন বেগার খাটিতেছে। নহিলে···

ফিরিবার পথে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিয়া সকল কথা বলিলাম।

ডাক্তার বলিল, আর এদিকের খবর জান না বুঝি? আমাদের হেমাঙ্গ মিত্তির যে বাবুদের কাছারী গিয়েছিল। সে নিজে ঐ চাকরীর জন্যে দরখাস্ত দিয়ে এসেছে। আর গয়ানাথের নামে সাতখানা ক’রে লাগিয়েছে।

হাসিয়া বলিলাম, এবার বুঝি হেমাঙ্গর পিছনে লাগলে?

—উপায় কি!

—বেশ! কিন্তু আমাকে ভাই রেহাই দাও। আমি তোমার কি ক'রেছি?

ডাক্তার হাসিল।

পথে রামহরি আমাকে আটকাইল। তাহার জমি এবারে আবাদ হইবে, না অনাবাদি পড়িয়া থাকিবে, এ সম্বন্ধে আমার মনের বাসনা সে জানিতে চায়।

বিস্মিতভাবে বলিলাম, বাপু, তোমার জমি-চাষের ভার যে আমি নিয়েছি, এ কথা তো জানতাম না।

এ রসিকতায় রামহরি :হাসিল না। কাতরভাবে যাহা জানাইল, তাহার মর্ম্ম এই যে, তাহার সমগ্র জমি গয়ানাথ ভাগে করে। সে সকল জমিতে এবার না পড়িয়াছে সার, না দেওয়া হইয়াছে চাষ। কোনো কোনো জমিতে লাঙল একবার করিয়া ঘুরাইয়া আনিয়াছে বটে, কিন্তু সে চাষ নয়, ইঞ্চিখানেক গভীর কতকগুলি জ্যামিতিক রেখার সমষ্টি। সে রেখাও জমির কোনো স্থানে পড়িয়াছে, কোনো স্থানে পড়ে নাই। এই অসময়ে তাহার কাছ হইতে জমি ছাড়াইয়া অন্য কাহাকেও যে দেওয়া হইবে, তাহারও উপায় নাই। আবার গয়ানাথকে বলিতে গেলে উল্টাইয়া সে-ই দু'কথা শোনাইয়া দেয়। বলে, আর দুইটা দিন পরে সে লাঙলের মুঠিতে হাত দিবে, রামহরি কি ইহাই ভাবিয়াছে? এই যা করিয়া দিল, তাহাই যথেষ্ট। বরং নয়নজলীর সীমানায় রামহরির যদি জমি থাকে তো তাহার খাজনা যেন ঠিক করিয়া রাখে। গয়ানাথের কাছে বাকি-বকেয়া চলিবে না।

রামহরি সাশ্রুনেত্রে আমার দিকে চাহিল।

অপ্রস্তুত ভাবে বলিলাম, বাপু, আমিও কম যন্ত্রণায় পড়িনি। ডাক্তারকে ধর, এ বিপদে তিনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা।

সেদিন দুপুরে অসহ্য গরম গেল। ভয় হইল বুঝি বা দম আটকাইয়াই মারা যাই। তার পরে প্রবল বৃষ্টি পথ-ঘাট সব ডুবাইয়া দিল। খড়ের চালের উপর বৃষ্টিপতন দেখিতে আমার বড় ভাল লাগে। বাহিরের ঘরে বসিয়া তাহাই একাগ্র নয়নে দেখিতেছিলাম। হঠাৎ ঝুপ ঝুপ করিয়া গয়ানাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। মাথায় তাহার নিজের তালের ছাতাটি তো আছেই। বগলে আর একটা ভাল ছাতা। কাহারও কাছ হইতে চাহিয়া আনিয়াছে বোধ হয়।

গয়ানাথ কখনও কোনো প্রকার ভূমিকা করে না। বলিল, চলুন।

—কোথায় হে! এই বর্ষায়···

—ছাতা এনেছি। পায়ে জল লাগবে না, কাঁধে ক'রে নিয়ে যাব। ডাক্তারবাবু পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে আনতে। সবাই সেখানে আছেন। খুব রগড় হয়েছে।

স্কন্ধারোহণের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলাম। কিন্তু উঠিতেও হইল। লোকটার সকাতর অনুরোধের একটা শক্তি আছে।

'না' বলা অসম্ভব। গিয়া দেখি, ডাক্তারের দাওয়াইখানার বারান্দায় হেমাঙ্গ গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। গয়ানাথ তাহাকেও আমার মতো করিয়া উঠাইয়া আনিয়াছে। মায় রমণী দাসকে পর্য্যন্ত। সকলের অনুরোধে হেমাঙ্গকে স্বীকার করিতে হইল, বাবুদের কাছারী যাওয়া সত্য, নিজের জন্য দরখাস্ত দেওয়াও সত্য। কেবল গয়ানাথের নামে সাতখানা করিয়া লাগাইয়া আসার সংবাদটা মিথ্যা। সে যাহাই হোক, এখন সে দরখাস্ত প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত। এমন কি, যে একটা টাকার অভাব পড়িতেছে, দণ্ডস্বরূপ তাহাও দিতে সম্মত হইয়া গেল। উল্লাসে গয়ানাথের বদনমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বাকি কেবল জামিননামা। আমরা তাহারই খসড়া করিতে বসিলাম।

গ্রহ আর কাহাকে বলে, এমন সময় মুখ অন্ধকার করিয়া অগ্রে রামহরি, তৎপশ্চাৎ গয়ানাথের গৃহিণী আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল। আমরা প্রমাদ গণিলাম।

রামহরিকে গয়ানাথ গ্রাহ্যই করিল না। আমাদিগকে বলিল, লিখুন।

কিন্তু আমরা লিখিতেছি না দেখিয়া পিছনে চাহিল। থামের আড়ালে অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া ফোঁস ফোঁস শব্দে তাহার গৃহিণী উদ্যত অশ্রু সংবরণ করিতেছে। বুঝিলাম, এইবারে স্বয়ং গয়ানাথের বিব্রত হইবার পালা আসিয়াছে।

তবু আমাদের সামনে পশার রাখিবার জন্য ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, যা, যা, তুই যা! মেয়েমানুষ বুঝিস না শুঁঝিস না, সব কাজে শুধু বাগড়া দিতে আসিস!

গয়ানাথের স্ত্রী অন্তরাল হইতে মিষ্টি মিষ্টি করিয়া বলিল, বাবু মশাই, আপনাদের ঘরে খাবার আছে, আমোদ করা পোষায়। কিন্তু ওকে চাষ করে নিজে খেতে হবে, আমাদের পোড়া পেটেও দু'এক দানা দিতে হবে। আমোদ করা ওর তো পোষাবে না।

গয়ানাথের স্ত্রী নিজের কথাটাই ভাবিয়াছে। এ আমোদ যে আমাদেরও আর পোষাইতেছে না তাহা জানে না। আমরা নিঃশব্দে শুনিতে লাগিলাম।

গয়ানাথ মুখ ঝামটা দিয়া বলিল, হ্যাঁঃ। আমোদ বই কি!

গয়ানাথের স্ত্রী এবার উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখের ঘোমটা খুলিয়া গেল। অন্তরাল হইতে সম্মুখে উঠিয়া আসিয়া হাত মুখ নাড়িয়া কাংস্যকণ্ঠে বলিল, আমোদ না তো কি রে মিন্‌সে! তুই গোমস্তা-গিরির জানিস কি যে তোকে গোমস্তা করবে! এটা বুঝতে পারিস না? তোর খাওয়া নেই, দাওয়া নেই···

সঙ্গে সঙ্গে রামহরিও আরম্ভ করিল। তারপর দুজনে মিলিয়া যে কাণ্ড আরম্ভ করিল, তাহার সহিত এক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরই উপমা দেওয়া চলে। সুযোগ বুঝিয়া হেমাঙ্গও আমাদিগকে আমাদের দুর্ভাগ্যের উপর সমর্পণ করিয়া অপর পক্ষে যোগ দিল। পলাইতে পারিলে বাঁচিতাম। কিন্তু গিরিসঙ্কটের দুই মুখ রামহরি আর গয়ানাথের স্ত্রী আটক করিয়া আছে। মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ধীরে ধীরে গয়ানাথের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইতে লাগিল, বিশেষ হেমাঙ্গর অকাট্য যুক্তি তার মোহাবরণ খান খান করিয়া কাটিয়া দিতে লাগিল। গয়ানাথ কিছুক্ষণ ধন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে তার মুখ ছাইএর মত শাদা হইয়া গেল। গয়ানাথ অকস্মাৎ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তেমন কান্না জীবনে কখনও দেখি নাই। সকলে ভয়ে বাক্-শক্তিহীন হইয়া পড়িলাম। ডাক্তার তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে একটা বোতলে করিয়া জল আনিয়া তাহার মুখে মাথায় দিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সেবা-যত্ন উপেক্ষা করিয়া গয়ানাথ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

লোকটা পাগল হইয়া গেল না কি !

ডাক্তার রীতিমত চটিয়া গেল। রামহরিকে বলিল, কাজটা কি ভাল হ'ল, রামহরি ? জমি-চাষের সময় তো এখনও যায় নি। না হয় আমরা নিজেরাই পয়সা খরচ করে চাষ করিয়ে দিতাম। কিন্তু হঠাৎ আশাভঙ্গে শোকে লোকটা যদি পাগল হয়ে যায়, কি হবে বল দেখি !

রামহরি এরূপ ভাবে নাই। অপ্রস্তুত হইয়া কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। আস্তে আস্তে গয়ানাথের রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে লইয়া সরিয়া পড়িল। কথাটা আমরাও ভাবিতে লাগিলাম। সেই আমোদ করাই ভাল ছিল, না এই ভুল ভাঙিয়াই ভাল হইল। কে জানে !

রিলিফ সেণ্টার

উপর্য্যুপরি দুইটা বৎসর মাত্র আধা ফসল পাওয়া গেল। গত বৎসর আবার একটি দানাও কাহারও গোলায় উঠিল না। দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। নিজের পেট চুলায় যাক, মানুষ কি করিয়া কচি-কাঁচাদের মুখে দুই বেলা দু'মুঠা শাকান্ন জুটাইবে তাহারই চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়িল।

গ্রামের বারো আনার জমিদার বিশ্বাসবাবুরা সার্টিফিকেটের জোরে ঠেঙাইয়া অস্থাবর ধরিয়া খাজনা আদায় করিতেছেন। ধনী মহাজনেও খাতকের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি নিলাম করিয়া লইতেছেন। কেবল বিপদে পড়িয়াছেন বাকি চার আনার যে সাত ঘর জমিদার আছেন তাঁহারাই। 'প্রেষ্টিজের' ভয়ে মুখ ফুটিয়া কাহারও কাছে দুঃখ জানাইতেও পারিতেছেন না, ঠেঙাইয়া খাজনা আদায় করিতেও অক্ষম। তাঁহারা অত্যন্ত গোপনে স্ত্রীর গায়ের গহনা চড়া সুদে বন্ধক দিয়া কোনো প্রকারে লাট রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু এদিকে স্ত্রীর গাত্রালঙ্কারও যেমন করিয়া কমিয়া আসিতেছে মহাজনের সংখ্যাও তেমনি হ্রাস পাইতেছে। টাকা আর কোথাও নাই। কেবল কয়েকটি নিঃসন্তান বিধবা কৃষক রমণীর কুটীরে কতকগুলি মলিন রজত মুদ্রা ভূগর্ভস্থ মৃৎপাত্রের অন্ধকারে এখনও টিকিয়া আছে। তাহারও পরিমাণ বেশী নয়। অর্থাৎ কাহারও এককালীন পাঁচশত টাকার প্রয়োজন হইলে এ অঞ্চলে কোনো এক ব্যক্তির গৃহে মিলিবার সম্ভাবনা নাই।

এমত অবস্থায় গ্রামের বিখ্যাত মামলাবিশারদ চাটুয্যে মহাশয় একদিন সদর হইতে একটা সুসংবাদ আনিলেন, শীঘ্রই সরকার হইতে রিলিফের ব্যবস্থা হইতেছে। এ গ্রাম হইতে ক্রোশ দুই

দূরের ডাকবাংলোয় তাহার আফিস বসিবে। আর ভাবিবার কোনো কারণ নাই।

রামরতন চাটুয্যে মহাশয়ের বৈঠকখানার এক কোণে কুঁজা হইয়া বসিয়া ছিল। জিরাফের মতো গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সেটা কি ব্যাপার চাটুয্যে মশাই ?

—আরে টাকা দেবে,—টাকা—টাকা।

রামরতন সোজা হইয়া বসিল। বলিল, সবাইকে ?

চাটুয্যে মহাশয় উষ্মার সহিত বলিলেন, সবাইকে মানে কি আমাকে দেবে ? যারা খেতে পাচ্ছে না, তাদেরই দেবে।

অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চা লইয়া রামরতনের বড় দুঃখেই দিন কাটিতেছে। কোনোদিন এক বেলা জোটে, কোনোদিন তা-ও জোটে না। উল্লসিত হইয়া বলিল, মাইরি ? দিন না কিছু পাইয়ে। আমার দুঃখু সবই তো আপনি জানেন।

চাটুয্যে মহাশয় কোন উত্তর দিলেন না গম্ভীরভাবে ধূমপান করিয়া যাইতে লাগিলেন।

অহিভূষণ রোখা লোক। তিনি এক ধমক দিলেন,—

—থাম্ বাপু, রিলিফ! কোথায় কি তার ঠিক নেই—সহরে আমের দর কি রকম দেখে এলে তাই বল।

চাটুয্যে একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, আমের দর নেই। মাঝারি আম চার আনা পণ। আর শুনবে ? তার চেয়ে যে কমা আম সে আর শহরে ঢুকতে পাচ্ছে না। শহরের বাইরে গাড়ী নামাচ্ছে, লোকে গরু বাছুরের জন্যে কিনছে।

খবর শুনিয়া অহিভূষণ লোভার্ত্ত হইয়া উঠিলেন।

—বল কি হে! আনলে না কেন পণটেক আম? দুজনে ভাগ ক'রে নেওয়া যেত। তোমার সেবারের বড় সিন্দুরিয়া আমের তার যেন এখনও মুখে লেগে রয়েছে।

সেবারের বড় সিন্দুরিয়া আম হইতে কিছু অহিভূষণকে ভাগ দেওয়া হইয়াছিল। অহিভূষণের একটা গুণ এই যে, ভাগের ভাগ কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লন, কিন্তু দামটা দিতে প্রায়ই ভুলিয়া যান। অথচ যে রোখা লোক, একবারের উপর দুইবার তাগাদা করিলেই চটিয়া যান। সেই কথা স্মরণ করিয়া চাটুয্যে এবারের আম আনার কথাটা চাপিয়া গেলেন।

বলিলেন, সময় পেলাম না হে। কাছারীর কাজ সারতেই···

অহিভূষণ কিন্তু দমিলেন না। বলিলেন, তোমার সেই বিলের মামলায় সাক্ষী মেনেছ না? সেই সময় বরং···

চাটুয্যে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, তার যো কি! চার আনার আম আনতে একটা টাকা খরচ। ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে। হাঃ, হাঃ, হাঃ!

—বল কি হে?

—দেখ না হিসেব ক'রে। একটা ঝুড়ির দাম দু' আনা, ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটা কুলি···

মনে মনে হিসাব করিয়া অহিভূষণ বলিলেন, তা বটে।

পরে বলিলেন, তা হোক। গোটা পঞ্চাশ আম চাদরে বেঁধে মাথায় ক'রেই নিয়ে আসব।

বলিয়া উৎসাহভরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রামরতন ধমক খাইয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে বসিয়া ছিল।

কিন্তু আমের ফাঁকা গল্পে মন ভরিতেছিল না। আবার বলিল, তা সে টাকাটা কদ্দিন নাগাৎ পাওয়া যাবে?

চাটুয্যে হাসিয়া বলিলেন, আফিস আগে বসুক তো!

আড্ডা ভাঙার পরে সকলে যখন চলিয়া গেল, চাটুয্যে বসিবার জায়গাগুলা ঘরের মধ্যে তুলিয়া রাখিতেছিলেন, অহিভূষণ পৌঁ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ডাকিলেন, চাটুয্যে উঠলে না কি?

—হ্যাঁ।

অহিভূষণ কাছে সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, রিলিফের কথা সত্যি না কি হে?

—সত্যি বই কি।

—কি রকম টাকা দেবে বল দেখি? আমারও যে কিছু টাকার দরকার।

চাটুয্যে চুপ করিয়া রহিলেন।

অহিভূষণ সকাতরে বলিলেন, দিন আর চলেনা চাটুয্যে।

চাটুয্যে দরজাটা বন্ধ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সে ব্যবস্থা করা যাবে, তার আর কি।

অহিভূষণ আরও দুই চারিটা দুঃখের কথা বলিয়া বিদায় লইলেন।

যে দুঃখের প্রতিকার নাই, মানুষ তাহা নীরবে সহ্য করিয়া যায়। এতদিন তাহাই যাইতেছিল। রিলিফ সেণ্টার খুলিতেই

চারিদিকে হাহাকার উঠিল। এতদিন মানুষ নিজের দুঃখ লইয়াই এমন বিব্রত ছিল যে, প্রতিবেশীর দিকে চাহিবার সময় পায় নাই। এখন দেখিল অন্নকষ্ট তাহার একার নয়, এমনি হাজার হাজার লোকের। নিরুপায় অবস্থায় সকলেই দুঃখের কঙ্কাল চাদর ঢাকা দিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল, একটু ভরসার বাতাস বহিতেই সমস্ত ঢাকা খুলিয়া গিয়াছে! সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাতারে কাতারে লোক চলিয়াছে রিলিফ সেণ্টারে।

চাটুয্যের কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। এই ছোট্ট দরিদ্র গ্রাম খানির মামলা মোকর্দ্দমা হইতে আরম্ভ করিয়া মেয়ের বিয়ে ছেলের অন্নপ্রাশন পর্য্যন্ত যাবতীয় ব্যাপারে চাটুয্যেই একপক্ষের পরামর্শ-দাতা। অপর পক্ষে আছে বিশ্বাস বাবুদের গোমস্তা পতিতপাবন। বাবুরা সার্টিফিকেটের ক্ষমতা পাওয়ার পর হইতে গ্রামের মধ্যে পতিতপাবনের ক্ষমতা কিছু বাড়িয়াছে এবং সেই অনুপাতে চাটুয্যের ক্ষমতা কিছু কমিয়াছে। সেই হৃতপ্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চাটুয্যে রিলিফের ব্যাপারে মাতিয়া উঠিলেন। ভোর হইতে না হইতে তাঁহার বৈঠকখানার উঠান সাহায্যপ্রার্থীর কলরবে মুখর হইয়া ওঠে। তিনি দাঁতন করিতে করিতে তাহাদের সঙ্গে আলাপ করেন :

—কি রে রামরতন, তোর সেই জমির পরচাটা আনলি?

রামরতন আগাইয়া আসিয়া একখণ্ড কাগজ তাঁহার দিকে ঠেলিয়া দিল। তাহার উপর একবার চক্ষু বুলাইয়াই চাটুয্যে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন,—

—ম'রেছে নির্ব্বংশের ব্যাটা, ওটা তো সেই বাবুদের গেলবারকার বাকি খাজনার সমন।

রামরতন হাত উল্টাইয়া বিরক্ত ভাবে বলিল, আজ্ঞে ওই যা আছে তা আছে। ঘরে কাগজ বলতে আর এক চিরকুট নেই। ওইটুকু চালের বাতায় ছিল তাই এনে দিলাম।

বোঝা গেল জমির পরচাখানা ফেলিয়া দিয়া তাহার বদলে অনেকটা সেই রকমের দেখিতে এই সমনখানা রামরতন এতদিন সযত্নে চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সরকারী ঋণ পাইতে গেলে পরচাখানাই প্রয়োজন, এখানা দেখাইয়া সিকি পয়সাও মিলিবে না। কাল হইতে রামরতন গোটা চাল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া চালখানাই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এই সব ভাবিয়া রামরতন চটিয়া গেল—কাহার উপর চটিয়া গেল বোঝা গেল না। বলিল, ওই যা পেলাম মশায়, ওতেই যা করার তাই করুন।

রামরতন চাটুয্যের অনুগত লোক। ডাকিতে হাঁকিতে সমস্ত কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসে। কিন্তু ওই তাহার কেমন একটা বদ অভ্যাস। কোনো কিছু না পারিলে হাওয়ার উপর চটিয়া যায়। তখন রাগিয়া বলে, এই যা হইল তা হইল, ইহাতেই কাজ চালাইয়া লও।

চাটুয্যে রামরতনের কথায় চটিলেন না। তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বুদ্ধি আছে। ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া উহাতেই যাহা করিবার তাহা করা যায়। জমিদারের সেরেস্তায় ওই জমির আর একখানা পরচা আছে। কিন্তু সেখানে পতিতপাবন

আছে। কি করিয়া তাহার হাত হইতে এক দিনের জন্যও পরচাখানা বাহির করা যায় তাহাই ভাবিবার বিষয়।

ওদিকে বাগ্দীপাড়ার লোকেরা মাধবীতলার নীচে এমন কলরব আরম্ভ করিয়াছে যে, কাণপাতা দায়। তাহাদের কাহারও এক ছটাক জমি নাই, অথচ কৃষিঋণের উপর তাহাদের দাবী কাহারও চেয়ে কম নয়। তাহাদের হাল-গরু সবই আছে এবং ভদ্রলোকের জমি ভাগে চাষ করিয়াও খায়। কিন্তু যেহেতু তাহাদের নিজের জমি নাই, সেহেতু তাহারা কোনো ঋণ পাইতেছে না। ইতিপূর্ব্বে রিলিফ সেণ্টারে কলরব করিয়া পুলিশের কাছে তাড়া খাইয়া আসিয়াছে। এখানকার কোলাহল তাহারই পূর্ব্বানুবৃত্তি।

চাটুয্যে মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, জমি না থাকলে তারা টাকা দেবে না। তা আমি কি করব বল?

তাহারাও নাছোড়বান্দা। বলিল, তা'হলে আমাদের না খেয়ে মরতে বলেন চাটুয্যে মশাই?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। চাটুয্যে মহাশয় উহাদের না খাইয়া মরিতে নিশ্চয়ই বলেন না। তিনি বলিলেন, তা কি করব বল্? দেখলি তো হাকিমের শুধু পা ধরতেই বাকি রাখলাম। আর কি করব? না দিলে তো আর মাথায় লাঠি মারতে পারি না।

বাগ্দীরা কথাটা কাণেই তুলিল না। বলিল, লোকে কোম্পানীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসে সুদে খাটাচ্ছে, আর আমরা খেতে পাই না।

—কে টাকা নিয়ে সুদে খাটাচ্ছে?—চাটুয্যে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

বাগ্দীরা তাহার মুখের সামনে আর তাঁহার নামটা করিতে পারিল না। বিশেষ তাঁহাকে চটাইয়া লাভ নাই, লোকসান।

বলিল, ওই বাবুদের গোমস্তা মশাই। কে না জানে?

চাটুয্যে খুসী হইয়া বলিলেন, ও ব্যাটার কাণ্ডই অমনি। দিতে পারবি হাকিমের কাছে সাক্ষী? বাছাধনকে তাহ'লে একবার সাত ঘাটের জল খাইয়ে ছাড়ি। পারবি?

অতখানি সাহস বাগ্দীদের নাই। জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না। পতিতপাবনও সে খবর ভালো করিয়া না জানিলে কখনই প্রকাশ্যে ধার দিতে পারিত না।

অকস্মাৎ সাক্ষ্য দেওয়ার কথায় সঙ্কুচিত হইয়া তাহারা বলিল, না বাবু, সে সব পারব না। পাঁচজনে যা বলে তাই শুনেছি। আমরা গরীব লোক। কি বল হে?

তাহাদের কাপুরুষতায় চটিয়া গিয়া চাটুয্যে কি একটা কড়া কথা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পান চিবাইতে চিবাইতে অহিভূষণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত লোকগুলিকে দেখিয়া এক গাল হাসিয়া বলিলেন, এসেছ বাবাসকল! ঋণ মিলল না?

অহিভূষণের কথায় কেহ রাগ করে না। লোকটির মন বড় সরল। এক কালে পৈতৃক বহু পয়সা নাড়াচাড়া করিয়াছেন। বিপদের সময় মানুষ তাঁহার কাছে কিছু চাহিয়া কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। এখন অবস্থা খুব মলিন হইয়া আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া এ বৎসর গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থদেরই যে প্রকার অবস্থা তাহাতে কি করিয়া দুই বেলা শাকান্নের সংস্থান যে তিনি

করিতেছেন তাহা ভাবিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কিন্তু সে কৃতিত্ব অহিভূষণের নয়, তাঁহার স্ত্রীর। অহিভূষণের চা জলখাবার হইতে কোনো বিষয়ের ত্রুটি নাই। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর দেহ দিন দিন অস্থিচর্ম্মসার হইতেছে। আয়ত নয়ন কোটরে ঢুকিয়াছে।

অহিভূষণ চাটুয্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ফজলি আম এসেছিল নিলে না কি ?

চাটুয্যে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না।

—হ্যাঁ আম বটে ! দুর্ভিক্ষের কল্যাণে দুটো ভালোমন্দ জিনিস খেয়ে বাঁচা গেল। জিনিসের যেন দাম নেই। এমনি বড় বড় ফজলি, নতুন উঠেছে, টাকায় আঠারোটা ক'রে। বিশ্বাস করতে পার ?

চাটুয্যে বিশ্বাস করিলেন কি না বোঝা গেল না।

অহিভূষণ ঠোঁট কোঁচকাইয়া বলিলেন, ও সব আম আগে এদিকে আসতই না। এখন কোন্ জিনিসটা আসছে না ? ফেরিওয়ালার ডাকে একটু দিবানিদ্রার উপায় নেই। যেন কলকাতা শহর হয়ে উঠেছে।

অহিভূষণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রামরতন বলিল, জিনিসের তো অভাব নয় দাদাঠাকুর, টাকারই অভাব। জিনিস কত নেবেন ?

—যা বলেছ ! টাকারই অভাব। দুটো ভালো জিনিস যে মনের সাধে কিনব তার যো নেই।

অহিভূষণ আবার হাসিলেন। বলিলেন, সেদিন অমন

চমৎকার কাঁটাল এল, চোখে দেখেই ফিরে এলাম। কাঁচা সোনার মতো কোয়া। কিন্তু করব কি, পয়সা নেই।

সোনার বরণ কাঁটালের কোয়ার কথা স্মরণ করিয়া অহিভূষণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

রামরতন সান্ত্বনা দিয়া কহিল, আপনার খাওয়ারই বা কসুর কি? এ গেরামে ক'জন লোক আপনার মতো খায়?

অহিভূষণ হাসিলেন। বলিলেন, তবে হ্যাঁ, আজকের ফজলি আম···তোমার কেনা উচিত ছিল চাটুয্যে।

চাটুয্যে মনে মনে বিরক্ত হইতেছিলেন। অহিভূষণের আর কোনো কথা নাই, কেবল আম, আর কাঁটাল, আর লিচু, আর মাছ, আর মাংস। লোকটা কেবল আহার এবং চালিয়াতি লইয়াই আছে। এদিকে দুই বেলা হাঁড়ি চড়ে, কি না চড়ে।

এমন সময় চাটুয্যের ভিতর হইতে ডাক আসিল।

চাটুয্যের মুখ-ধোয়া হইয়া গিয়াছিল। গাড়ুটা হাতে করিয়া ভিতরে গেলেন। গৃহিণী তাঁহাকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার হাতে একটি সোনার নাকচাবি দিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা রেখে একটা টাকা দেওয়া যায়?"

চাটুয্যে যেমন বাহিরে তেজারতি করিতেন তাঁহার গৃহিণীরও তেমনি মেয়ে-মহলে কিছু তেজারতি চলিত। বন্ধকী গহনার

কারবার, অবশ্য ছোট-খাট। কিন্তু তাঁহার ব্যবসাটা চাটুয্যের চেয়েও লাভজনক। চাটুয্যে পুরুষ-মহলে টাকায় চার পয়সার বেশী সুদ পাইতেন না, আর তাঁহার গৃহিণীর সুদের হার টাকায় ছয় পয়সা। তবু যে লোকে তাঁহার কাছে টাকা লইতে আসে তার কারণ ব্যাপারটা নিরিবিলি এবং গোপনে সম্পন্ন হয়।

চাটুয্যে নাকচাবিটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন সেকালের গহনা। ওজনেও যেমন ভারি সোনাও তেমন খাঁটি।

জিজ্ঞাসা করিলেন, কত চায় ?

—এক টাকা। দেওয়া যায় ?

সাধারণ ক্ষেত্রে দেওয়া যায় না। কিন্তু জিনিসটা যেন ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল। কোথায়, কার নাকে, মনে করিতে পারিলেন না। জিনিসটা দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে যেন কোন দূর অতীতকালের হাওয়া মিষ্টি মিষ্টি বহিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলেন, কার জিনিস বল তো ?

গৃহিণী মুখে আঁচল-চাপা দিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, অহিভূষণের বৌয়ের। দরজায় আমওলা বসিয়ে রেখে টাকা ধার করতে এসেছিলেন। বললাম একটু পরে আসতে।

তাই বটে। এতক্ষণে মনে পড়িল। কিন্তু জিনিসটা অহিভূষণের স্ত্রীরও নয়, অহিভূষণের মায়ের। উহার লাল পাথরটা তাঁহার গৌরবর্ণ সুন্দর ঋজু নাসিকায় আগুনের শিখার মতো জ্বল জ্বল করিত। ঘনপল্লবভারাতুর আয়ত চোখের নীচে ওই

পাথরটিকে ছেলেবেলায় তাহার অসীম রহস্যময় মনে হইত। সে কেবলই চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। সেই নাকচাবিটাই বটে, কিন্তু তেমন নয়। সে শ্রী নাই, সে শোভা নাই, সে রহস্যও যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন ওটা শুধুই সোনা। সোনা আর একটুকরা পাথর।

চাটুয্যে একটু ভাবিয়া বলিলেন, দু'টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যায়।

তাঁহার ঔদার্য্য গৃহিণীর অপরিচিত। হাসিয়া বলিলেন, যা বলেছ! তাহ'লে আট আনা দিই, কেমন।

চাটুয্যে কিন্তু হাসিলেন না। বলিলেন, না আট আনা কেন দুটো টাকাই দিও। অহিভূষণ আমার হাত দিয়ে শীগগিরই কিছু টাকা পাবে। সেই সময় কাটিয়ে নিলেই চলবে।

গৃহিণী যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যি বলছ তো?

চাটুয্যে নাকচাবিটা তাঁহার হাতে ফেরৎ দিয়া বলিলেন, সত্যি বলছি। আর লোকটা আমার বড় উপকারী। সেবারে সেই দায়রার মামলায়···তাই দিও, দুটো টাকাই দিও। বেচারা বড় অভাবে পড়েছে।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, অভাব আবার কি! আম কিনছেন, লিচু কিনছেন। অমন নোলায় আগুন দিতে হয়।

চাটুয্যে শুধু একটু হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণীর সঙ্গে তর্ক করিলেন না। বোধ হয় অহিভূষণের ছেলেবেলার প্রাচুর্য্যময় দিনগুলির কথা স্মরণ হইল।

বাহিরে গিয়া চাটুয্যে অহিভূষণকে বৈঠকখানার ঘরের ভিতরে ডাকিলেন। অহিভূষণ তখন পোলাও রান্না সম্বন্ধে শ্রোতৃবৃন্দের জ্ঞানোন্মেষের চেষ্টা করিতেছিলেন। জমাট আড্ডা ভাঙিয়া খুব বিরক্তভাবেই ভদ্রলোক উঠিয়া আসিলেন।

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি?

চাটুয্যে চুপি চুপি বলিলেন, কৃষিঋণের টাকা নিতে গেলে আর দেরী করা ঠিক নয়, অহিভূষণ। চল আজকেই বেরুনো যাক।

কোথায় পোলাও, আর কোথায় কৃষিঋণ! অহিভূষণের মন শ্রবণমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

চাটুয্যে বলিতে লাগিলেন, তোমাকে কিছু করতে হবে না। সব আমি ঠিক ক'রে রেখেছি। শুধু একখানা কাগজে টিপসই দিয়ে হাকিমের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে আসা।

সাফল্য গৌরবে চাটুয্যে হাসিতে লাগিলেন।

অহিভূষণ কিন্তু সাড়াশব্দ দিল না, কোনো উৎসাহও দেখাইল না।

তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাটুয্যে আবার বলিলেন, নতুন ফজলি উঠছে, খুব খাবে ক'দিন। কি বল?

অহিভূষণ তাড়াতাড়ি বলিলেন, থাক ভাই, ও সবে আর কাজ নেই।

—বল কি! তুমি নিজেই বলেছিলে···

—না ভাই, আমি ওদের গায়ে গা দিয়ে দাঁড়িয়ে টাকা নিতে পারব না। ব'লে—বাইরে উপবিষ্ট লোকদের দিকে আঙুল দিয়া

দেখাইলেন। বলিলেন, আমার বড় কষ্ট চাটুয্যে। বৌটা তো না খেয়ে খেযে কঙ্কালসার হয়েছে। এক একদিন না খেয়েই…

অহিভূষণের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া বলিল, অনেক ভেবে দেখেছি চাটুয্যে, ও-সব পারব না। তার চেয়ে ভগবান যা করেন তাই হবে।

চাটুয্যে আর একটা কথাও বলিতে পারিলেন না।

বাহিরে তখন কোলাহল উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। এক টুকরা হাড়ের জন্ত কুকুরে যেমন খেয়ো-খেয়ি করে তেমনি। বাগ্দীপাড়ার দুই দলে কৃষিঋণের টাকা লইয়া বুঝি একটা দাঙ্গাই বাঁধায়। চাটুয্যে আর অহিভূষণ তাহাদের থামাইবার জন্ত তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। গোলমাল অবশ্য থামিয়া গেল। লাভের মধ্যে অহিভূষণের পোলাও সম্বন্ধে অমন উপাদেয় বক্তৃতাটাই মাঠে মারা গেল।